আলেক্সান্দর রাস্কিন
বাবা যখন ছোটো

আলেক্সান্দ্র রাস্কিন

বাবা যখন ছোটো

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

ছবি এঁকেছেন ল. তকমাকভ

А. Раскин
КАК ПАПА БЫЛ МАЛЕНЬКИМ
На языке бенгали

সূচি

বাবা যখন ছোটো

ইশকুলে বাবা

আমার মেয়েকে

লেখকের কথা

আদরের ছেলেমেয়েরা!

এ বইয়ের জন্মকথাটা বলি শোনো। আমার এক মেয়ে আছে — সাশা। এখন অবিশ্যি দিব্যি বড়োসড়ো হয়ে উঠেছে সে, নিজেই বলে, 'আমি যখন ছোট্ট ছিলাম...' তা এই সাশা যখন ছিল একেবারেই ছোট্ট তখন ভারি ভুগত সে। কখনো ইনফ্লুয়েঞ্জা, কখনো টনসিলাইটিস। তারপর কানের ব্যথা। তোমাদের যদি কখনো কান কটকট রোগ হয়ে থাকে, তাহলে নিজেরাই বুঝবে সে কী যন্ত্রণা। আর যদি না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝিয়ে বলা বৃথা, কেননা সে বোঝানো অসম্ভব।

একবার সাশার কানের যন্ত্রণা খুব বাড়ল, সারা দিন রাত সে কাঁদলে, ঘুমতে পারছিল না। আমার এত কষ্ট লাগছিল যে নিজেরই প্রায় কান্না এসে গিয়েছিল। নানা রকম বই পড়ে শোনাচ্ছিলাম আমি, নয়ত মজার মজার গল্প বলছিলাম। বলছিলাম ছোটোবেলায় কী রকম ছিলাম আমি, নতুন বল ছুঁড়ে দিয়েছিলাম মোটর গাড়ির নিচে। গল্পটা সাশার ভারি ভালো লাগল। ভারি ভালো লাগল যে তার বাবাও একদিন ছোট্ট ছিল, দুষ্টুমি করত, কথা শুনত না, শাস্তি পেত। কথাটা মনে ধরল তার। তারপর থেকে যেই কান কটকট করত অমনি সাশা ডাকত, 'বাবা, বাবা, শীগগির! কান কটকট করছে, বলো না ছোটোবেলায় তুমি কী করতে!' আর ওকে

যেসব কথা শুনিয়েছিলাম সেইগুলিই তোমরা এখন পড়বে। গল্পগুলো একটু মজার, মেয়েটির রোগের যন্ত্রণা ভোলাতে হচ্ছিল তো। তাছাড়া লোভ, বড়াই, ন্যাকামি জিনিসগুলো যে কত খারাপ সেটাও মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছিলাম বৈকি। তবে ভেবো না যে আমি সারা জীবনই ছিলাম অমনি লোভী, ন্যাকা। খুঁজে খুঁজে শুধু খারাপ ঘটনাগুলোই বেছেছি। আর নিজের জীবনে তেমন ঘটনা না পেলে, অন্য কোনো বাবার জীবন থেকে নিলেই বা কে আটকায়। সবাই তো একদিন ছোটোই ছিল। মোট কথা, গল্পগুলো বানানো নয়, সবই সত্যি।

এখন সাশা বড়ো হয়েছে। ভোগে সে এখন কম, নিজে নিজেই বড়ো বড়ো মোটা মোটা বই পড়ে।

তবে মনে হল, একজনকার বাবা ছেলেবেলায় কী করত সেটা শুনতে অন্য ছেলেমেয়েদেরও ভালো লাগতে পারে।

এইটুকুই আমার বলবার কথা। তবে আরেকটি জিনিস আছে, সেটা বলতে চাই গোপনে। বইটি কিন্তু অসমাপ্ত। তার শেষটা আছে তোমাদের সকলের নিজের নিজের সংসারে। কেননা প্রত্যেকেরই তো বাবা আছে আর ছোটোবেলায় তিনি কী করতেন সেটা সবাই শোনাতে পারেন। পারেন মা-ও। বলতে কি, আমি নিজেই সে গল্প শুনতে ভারি উৎসুক।

এবার তোমাদের সকলের সুখ আর স্বাস্থ্য কামনা ক'রে বিদায় নিই!

তোমাদের

আ. রাস্কিন

বাবা
যখন ছোটো

বাবা যখন ছোটোটি, থাকত পাভলভো-পসাদ নামে এক ছোট্ট শহরে, তখন ভারি সুন্দর, মস্ত একটা বল সে উপহার পেয়েছিল। ঠিক যেন সূর্যের মতো বলটা। বলতে কি, সূর্যের চেয়েও সুন্দর। কেননা সূর্যের দিকে চোখ না কুঁচকে তো তাকানো যায় না, আর এ বলটাকে চেয়ে দেখতে হলে চোখ কোঁচকাবারও দরকার হত না। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক চারগুণো সুন্দর সূর্যের চেয়ে — কেননা চার রঙে জ্বলজ্বল করত সেটা। আর সূর্যের তো কেবল একটা রঙ, তাও চেয়ে দেখা মুশকিল। একটা দিক লেডিকেনির মতো গোলাপী, আরেকটা দিক সবচেয়ে মিঠে চকোলেটের মতো খয়েরি, ওপরটা আকাশের মতো নীল, আর তলটা ঘাসের মতো

সবুজ। এমন বল সে শহরে কেউ কখনো দেখে নি। কিনে আনতে হয়েছিল একেবারে খোদ মস্কো থেকে। আর মস্কোতেও তেমন বল কম বলেই আমার ধারণা। দেখতে আসত শুধু ছোটোরা নয়, বড়োরাও।

'এ একটা বলের মতো বল!' বলত সবাই।

সত্যিই খাসা বল। বাবার ভারি গর্ব ছিল তাই নিয়ে। এমন ভাব করত যেন নিজেই সে বলটা ভেবে ভেবে বানিয়েছে, চার রঙে রাঙিয়েছে। খেলবার জন্যে বলটা নিয়ে গরব ক'রে বেরলেই ছুটে আসত সব ছেলেরা। বলত:

'বাঃ, কী সুন্দর বল! আয় না খেলি!'

বাবা কিন্তু বল আঁকড়ে ধ'রে বলত:

'দেব না! আমার বল! এমন বল কারো নেই! মস্কো থেকে কিনে এনেছে জানিস! সরে যা! আমার বল কেউ ছুঁবি না ব'লে দিচ্ছি!'

ছেলেরা বলত:

'ইস, কী হিংসুটে দ্যাখ ভাই!'

তা শুনেও বাবা কিন্তু বলটি আর দিত না। খেলত একা একা। তবে একা একা কি খেলা জমে। আর হিংসুটে বাবা কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই বলটা খেলত ঠিক ছেলেগুলোর কাছাকাছি, যাতে হিংসে হয় ওদের।

ছেলেরা তখন বলত:

'ভারি কিপটে ছেলেটা। ওর সঙ্গে আমাদের আড়ি!'

দু' দিন আড়ি চলল। তিন দিনের দিন ছেলেরা বললে:

'বলটা তোর মন্দ নয়, তা ঠিক। বেশ বড়ো, খাসা রঙ করা, কিন্তু অতো চাল দেখাচ্ছিস কিসের? মোটর গাড়ি চাপা পড়লে যে কোনো বাজে বলের মতোই ফেটে যাবে।'

'কখখনো ফাটবে না!' গরব ক'রে বললে বাবা, অহঙ্কারে ততদিনে তার মাটিতে আর পা পড়ে না, শুধু বলই নয়, নিজেও যেন সে চার রঙে রাঙা।

'ফট ক'রে ফেটে যাবে রে, ফেটে যাবে!' হেসে উঠল ছেলেরা।

'না ফাটবে না!'

ছেলেরা বললে, 'ওই তো মোটর আসছে। কী, ছুঁড়ে ফ্যাল দেখি? নাকি ভড়কে গেলি?'

ছোট্ট বাবা বল ছুঁড়ে দিলে গাড়ির নিচে। এক মিনিট আড়ষ্ট হয়ে রইল সবাই। সামনের দুই চাকার তল দিয়ে গলে পেছনের ডান চাকায় ধাক্কা খেলে বলটা। খানিকটা কেমন পিছলে গিয়ে বলটা ফেলে এগিয়ে গেল গাড়িটা। কিছুই হল না বলটার।

'ফাটে নি, দেখলি তো, ফাটে নি!' চিৎকার ক'রে বাবা ছুটে গেল বলটার দিকে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই এমন জোর শব্দ হল যেন কামানে তোপ পড়ল। বল ফাটার আওয়াজ আর কি। বাবা গিয়ে দেখলে পড়ে আছে ধুলোমাখা রবারের এক ন্যাতা, একেবারেই সুন্দর নয় দেখতে। কেঁদে বাড়ি ছুটল বাবা। ছেলেরা একেবারে আকাশ ফাটিয়ে হাসতে লাগল।

'ফেটেছে! ফেটেছে! যেমন কিপটে, ঠিক হয়েছে তোর!'

বাবা বাড়িতে গিয়ে যখন বললে সে নিজেই অমন সুন্দর বলটা মোটরের তলে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন প্রথম চড় খেলে ঠাকুমার কাছে। সন্ধ্যায় ঠাকুর্দা কাজ থেকে ফেরার পর আরো একদফা। ঠাকুর্দা বললেন:

'বলটার জন্যে মারছি না, মারছি তোর বোকামির জন্যে!'

অমন সুন্দর বল, গাড়ির তলে ফেলল কী ব'লে — এই ভেবে এর পরেও অনেক দিন সবাই অবাক হয়ে যেত।

একেবারে নেহাৎ আহাম্মুক না হলে কি আর কেউ অমন করে।

সবাই জ্বালাত বাবাকে, জিজ্ঞেস করত:

'কী রে, তোর সেই নতুন বলটি কোথায়?'

হাসাহাসি করে নি কেবল জেঠু। গোড়া থেকে সব ঘটনাটা সে বাবার কাছ থেকে খুঁটিয়ে শুনলে। তারপর বললে:

'না, বোকা তুই নোস!'

শুনে ভারি আনন্দ হয়েছিল বাবার।

'কিন্তু ভারি হিংসুটে তুই, অহঙ্কারী,' বললে জেঠু, 'তোর পক্ষে তার ফলটা কখনো ভালো হবে না। নিজের বল নিয়ে যে একা একা খেলতে চাইবে, তার সবই যাবে। সেটা যেমন ছোটোদের বেলায়, তেমনি বড়োদের বেলাতেও। তোর স্বভাব না বদলালে সারা জীবনই তোর এই হবে।'

তখন ভারি ভয় পেয়ে গেল বাবা, ডাক ছেড়ে কাঁদলে, বললে হিংসুটেপনা করবে না সে, জাঁক করবে না। অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদলে বাবা, তাই বাবার কথায় বিশ্বাস ক'রে নতুন বল কিনে দিলে জেঠু। সে বল অবিশ্যি তত সুন্দর নয়, তবে পাড়ার সব ছেলেই সে বল নিয়ে খেলত। খেলা জমত চমৎকার, বাবাকে কেউ আর হিংসুটে ব'লে খোঁচাত না।

বাবা যখন ছোটো, তখন একবার সে যায় সার্কাস দেখতে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কত কাণ্ডকারখানা। তবে সবচেয়ে তার ভালো লাগল বুনো জন্তুর খেলোয়াড়কে। যেমন সুন্দর তার সাজ পোষাক তেমনি সুন্দর তার নাম, বাঘ সিংহ সবাই তার ভয়ে থরহরি। সঙ্গে পিস্তল ছিল তার, হাতে চাবুক, কিন্তু সেগুলো সে প্রায় চালাচ্ছিল না। রঙ্গমঞ্চ থেকে সে ঘোষণা করলে:

'জানোয়ারে যে ভয় পায়, সেটা আমার চোখকে! আমার চাউনি — এই হল আমার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার! বুনো জানোয়ার মানুষের চাউনি সইতে পারে না!'

সত্যিই, সিংহের দিকে শুধু একবার চাইছে মাত্র, সিংহও অমনি টুলে বসছে, লাফিয়ে যাচ্ছে পিপের ওপর, এমন কি মড়ার মতো শুয়ে পড়ছে, চাউনি ওর সইতে পারছে না।

অর্কেস্ট্রায় ঝঙ্কার উঠল, লোকে হাততালি দিলে, সবাই চেয়ে রইল খেলোয়াড়ের দিকে: লোকটা বুকে হাত রেখে চারিদিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলে। একেবারে জমজমাট ব্যাপার! বাবারও ইচ্ছে হল সে বুনো জন্তু পোষ মানাবে। ঠিক করলে প্রথমে এমন কোন জন্তুকে চোখ দিয়ে বশ করা যাক, যে তত হিংস্র নয়। বাবা তো তখনো ছোটো, বাঘ সিংহের মতো বড়ো বড়ো জানোয়ারকে এঁটে ওঠা যে তার সাধ্যের বাইরে সেটা বাবা জানত। শুরু করা ভালো কুকুর দিয়ে, তাও খুব বড়ো কুকুর হলে চলবে না, কেননা বড়ো কুকুর মানে তো প্রায় ছোট এক সিংহই। তাই ছোটো এক কুকুর হলেই সুবিধা।

শীগগিরই তেমন একটা সুযোগ মিলল।

ছোট্ট শহর পাভলভো-পসাদ, ছোট্ট একটা পার্কও ছিল সেখানে। এখন সেখানে অবিশ্যি মস্ত এক সংস্কৃতি ও বিরাম উদ্যান, কিন্তু ঘটনাটা যে অনেক দিন আগের। আর ছোট্ট বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এই পার্কে একদিন বেড়াতে গেলেন ঠাকুমা। বাবা খেলছে, ঠাকুমা বই পড়ছেন, একটু দূরে সাজসজ্জা ক'রে ব'সে আছেন এক মহিলা, সঙ্গে কুকুর। ইনিও বই পড়ছিলেন। কুকুরটা ছোট্ট, শাদা রঙ, বড়ো বড়ো কালো চোখ। বড়ো বড়ো সেই চোখ দিয়ে যেন ছোট্ট বাবার কাছে মিনতি করছিল কুকুরটা, 'ভারি বশ মানার সখ আমার! এই ছেলে, বশ মানাও না আমায়। লোকের চাউনি আমি একেবারেই সইতে পারি না!'

ছোট্ট বাবাও অমনি গোটা পার্কটা পাড়ি দিলে কুকুরকে বশ করতে। ঠাকুমা বই পড়ছিলেন, কুকুরের গিন্নিও বই পড়ছেন, কেউ সেদিকে নজর করেন নি। বেঞ্চির তলে শুয়ে ছিল কুকুরটা, বড়ো বড়ো কালো চোখে হেঁয়ালি নিয়ে চেয়ে ছিল ছোট্ট বাবার দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল বাবা (তখন তো বাবা খুবই ছোটো), ভাবছিল, 'নাঃ, আমার চাউনিতে দেখছি কুকুরটার কিছু হচ্ছে না... সিংহ দিয়ে শুরু করলেই কি তাহলে ভালো হত? কুকুরটা দেখছি বশ মানবে না ঠিক করেছে।'

ভারি গরম পড়েছিল সেদিন, বাবার পরনে হাফপ্যাণ্ট, পায়ে স্যাণ্ডাল। এগিয়ে আসছে বাবা, আর চুপ ক'রে শুয়েই আছে কুকুরটা। কিন্তু একেবারে কাছে আসতেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কুকুরটা কামড়ে দিলে বাবার পেটে। ভয়ানক হৈচৈ বেধে গেল চারিদিকে। বাবা চিৎকার করছে, ঠাকুমা চিৎকার করছেন, কুকুরের গিন্নিও চিৎকার জুড়েছেন। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে কুকুর।

বাবা চেঁচাচ্ছে:

‘উহ্‌রে, কুকুরে কামড়েছে আমায়!’

ঠাকুমা চেঁচাচ্ছেন:

‘ওই মাগো, কুকুরে কামড়েছে ওকে!’

আর কুকুরের গিন্নি চ্যাঁচাচ্ছেন:

‘ও কুকুর যে একেবারেই কামড়ায় না! কুকুরকে জ্বালাতন করছিল ছেলেটা!’

আর কুকুরটা যে কী বলছিল সে তো বুঝতেই পারছ।

যত রাজ্যের লোকজন ছুটে এসে চ্যাঁচাতে লাগল:

‘কী জঘন্য ব্যাপার! কী জঘন্য ব্যাপার!’

এই সময় পাহারাওয়ালা এসে হাজির হল, জিজ্ঞেস করলে:

‘কী রে খোকা, কুকুরটাকে খোঁচাচ্ছিলি?’

‘না তো,’ বাবা বললে, ‘আমি ওকে বশ করছিলাম।’

সবাই হেসে উঠল। পাহারাওয়ালা বললে:

‘কিন্তু বশ করছিলি কী দিয়ে?’

বাবা বললে:

‘একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছিলাম। দেখছি মানুষের চাউনি ও সইতে পারে না।’

ফের হেসে উঠল সবাই।

মহিলাটি বললেন:

‘দেখলেন তো, ছেলেটার নিজেরই দোষ। কে ওকে বলেছিল আমার কুকুরকে বশ করতে? আর আপনাকে,’ ঠাকুমার দিকে ফিরে বললেন, ‘জরিমানা করা দরকার আপনাকে, ছেলেমেয়েদের সামলে রাখতে পারেন না!’

ঠাকুমা এমনই অবাক হয়ে গেলেন যে কিছুই বললেন না, একেবারে থ’ মেরে গেলেন। পাহারাওয়ালা তখন বললে:

‘দেখছেন তো, নোটিশ ঝুলছে: কুকুর আনা নিষেধ! যদি নোটিশে থাকত: ছেলেমেয়েদের আনা নিষেধ! তাহলে ছেলের মাকেই জরিমানা করতাম। অতএব এবার আপনাকেই জরিমানা দিতে হবে। সরে পড়ুন কুকুরটি নিয়ে। ছেলেয় খেলছে, কুকুরে কামড়াচ্ছে। খেলা করা এখানে চলবে, কিন্তু কামড়ানো চলবে না! তবে খেলতেও হয় বুদ্ধি ক’রে। কেন তুই কুকুরটার দিকে এগুচ্ছিলি সেটা তো আর কুকুরটা জানে না। বলা তো যায় না, তুই হয়ত কামড়াতেই আসছিস, কুকুরটা তো আর সেটা জানে না, বুঝেছিস?’

বাবা বললে:

'বুঝেছি।' জানোয়ার বশ করার কোনো সাধই আর তখন তার ছিল না। আর পাছে কিছু আবার একটা হয় এই ভেবে বাবাকে যে সব ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল তার পরে তো বাবার একেবারেই ও পেশায় ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

আর মানুষের দৃষ্টি সইতে পারা না পারা নিয়ে বাবার তখন একেবারেই অন্য মত। পরে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাবার। দুজনের মতে কোনো গরমিল দেখা যায় নি। মস্ত এক বদরাগী কুকুরের চোখের পাতার লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করেছিল সে।

কুকুরটা যে ছেলেটার পেটে কামড় দেয় নি, তাতে কিছু এসে যায় না, কেননা সঙ্গে সঙ্গেই সে তার দুই গালেই দাঁত বসায়। ছেলেটার মুখের দিকে চাইলেই সেটা দিব্যি বোঝা যায়। তাহলেও ইনজেকশন কিন্তু তার পেটেই দেওয়া হয়েছিল।

বাবা যখন ছোটো, তখন কেবলি পড়ত সে। পড়তে শিখেছিল বাবা চার বছর বয়সে, পড়া ছাড়া আর কিছুতেই ঝোঁক ছিল না তার। অন্য ছেলেরা লাফ ঝাঁপ ছুটোছুটি করছে, মজার মজার খেলা খেলছে নানা রকম, ছোট্ট বাবা কিন্তু তখন ব'সে আছে তার বইটি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দা ঠাকুমার দুশ্চিন্তা হল। সারাক্ষণ বই নিয়ে থাকালে ক্ষতি হবে বৈকি। বই উপহার দেওয়া বন্ধ হল, হুকুম হল পড়া চলবে কেবল দিনে তিন ঘণ্টা। তাতে কিন্তু ফল হল না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছোট্ট বাবার বই পড়া বন্ধ হল না। নিয়মমতো তিন ঘণ্টা বাবা পড়ত লোকের সামনে। তারপর লুকিয়ে যেত। লুকত খাটের নিচে, সেখানে পড়ত।

লুকত চিলেকুঠরিতে — সেখানে পড়ত। চলে যেত বিচালি গোলায়, সেখানে পড়ত। এই জায়গাটাই ছিল সবচেয়ে ভালো। তাজা বিচালির গন্ধ উঠত সেখানে। ঘর থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসত: সেখানে সবকটি খাটের নিচে ছোট্ট বাবার তল্লাস চলছে। বাবা কিন্তু দেখা দিত ঠিক সন্ধের খাবার সময়। শাস্তি পেতে হত বৈকি। চটপট খেয়ে শুয়ে পড়ত বাবা। রাতে ঘুম ভেঙে আলো জেবলে ফের সকাল অবধি পড়ত। পড়ত চুকোভস্কির লেখা 'কুমির', পুশকিনের রূপকথা, 'আরব্য রজনীর গল্প', 'গালিভারের ভ্রমণ', 'রবিনসন ক্রুসো'। আর দুনিয়ায় সুন্দর সুন্দর বই কি আর কম! ইচ্ছে হত সবগুলোকে প'ড়ে শেষ করে। দেখতে না দেখতে কেটে যেত সময়। ঘরে ঢুকতেন ঠাকুমা, বই কেড়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিতেন। কিছুটা চুপচাপ থাকার পর ছোটো বাবা ফের আলো জবালত, টেনে নিত সমান মনোহর অন্য আরেকটা বই। ঘরে ঢুকতেন ঠাকুর্দা বই কেড়ে আলো নিভিয়ে বহুক্ষণ শাস্তি দিতেন ছোট্ট বাবাকে।

ব্যথা তত লাগত না বটে, তবে ভারি অভিমান হত।

এর পরিণাম দাঁড়াল খুবই খারাপ। ছোট্ট বাবার চোখ খারাপ হয়ে গেল — খাটের তলে, কি চালের নিচেকার মাচায়, কি বিচালি গোলায় তো আর আলো থাকত না বিশেষ। তাছাড়া শেষের দিকে চালাকিও খাটাত, আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে এক কোণে একটু ফাঁক রেখে দিত আলোর জন্যে। আর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে বই পড়া তো খুবই অনিষ্টকর। তাই ছোট্ট বাবাকে চশমা নিতে হল।

তাছাড়া ছোট্ট বাবা কবিতাও বানাত:

বেড়াল দেখলে বলত: — বেড়াল
এ কী তোর খেয়াল!
কুকুর দেখলে বলত: — কুকুর
একটু কর সবুর!
মোরগ দেখলে বলত: — হলদে ঝুঁটি, হলদে ঝুঁটি
বাচ্চা তোর কত কটি?
আর নিজের বাবাকে দেখলে বলত: — বাবা!
লজেঞ্চুস দিবা?

কবিতাগুলো ঠাকুর্দা ঠাকুমার ভালোই লাগত। টুকে রাখতেন, অন্যদের দিতেন। বাড়িতে কোনো লোক এলে ছোট্ট বাবার ওপর হুকুম হত:

‘তোর কবিতা শোনা তো একটা!’

ছোট্ট বাবাও সানন্দে শোনাত তার বেড়াল নিয়ে নতুন কবিতাটা, যার শেষটা এই রকম:

বেড়ালটার সাহস ছিল
জানলা দিয়ে ঝম্পিল!

শুনে সবাই খুব হাসত। কবিতাগুলো যে বাজে তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। ও রকম কবিতা সবাই বানাতে পারে। কিন্তু ছোট্ট বাবার মনে হত কবিতাগুলো অনবদ্য। ভাবত লোকেরা বুঝি হাসছে তার তারিফ ক'রেই। ধ'রে নিলে সে রীতিমতো লেখক হয়ে পড়েছে। যে কোনোই জন্মদিনেই কবিতা শোনাত বাবা। শোনাত ভোজের আগে, ভোজের পরে। লিজা পিসির যখন বিয়ে হল, তখনো কবিতা লিখলে একটা। তবে তার পরিণামটা ভালো দাঁড়াল না, কেননা কবিতার শুরুটা ছিল এই রকম:

কেবা ভাবতে পেরেছিল, দেখহ,
লিজা পিসির হচ্ছে কিনা বিবাহ!

এইটুকু শুনেই অতিথিরা ভয়ানক হাসতে থাকে, লিজা পিসি কিন্তু কেঁদে দিয়ে ছুটে পালায় তার নিজের ঘরে। বর না কাঁদলেও হাসে না। বাবাকে অবিশ্যি এর জন্যে শাস্তি পেতে হয় নি। লিজা পিসিকে কোনো রকম অপমানের কোনো ইচ্ছেই বাবার ছিল না। কিন্তু মোটের ওপর বাবা লক্ষ ক'রে দেখলে, পরিচিতদের কারো কারো কাছে তার পদ্য আর তেমন ভালো ঠেকছিল না। একবার তো সে নিজের কানেই শুনলে একজন আরেকজনকে বলছে:

‘ভুন্দেরখেন্দটি এবার ফের ছাইপাঁশ শুরু করবে।’

বাবা তখন ঠাকুমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে:

‘আচ্ছা মা, ভুন্দেরখেন্দ মানে কী?’

ঠাকুমা বলেন:

‘তার মানে অসাধারণ ছেলে।’

‘কী করে সে?’

‘মানে হয়ত বেহালা বাজায় কি মনে মনে অঙ্ক কষে, নয়ত প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে মাকে জ্বালায় না।’

‘আর যখন বড়ো হয়?’

'তখন প্রায়ই সে সাধারণ লোক হয়ে দাঁড়ায়।'

শুনে বাবা বললে:

'বুঝেছি।'

পরের জন্মদিনে বাবা আর কবিতা শোনালে না। বললে মাথা ধরেছে। সেই থেকে অনেক দিন সে আর কবিতা লেখে নি। এমন কি এখনো পর্যন্ত জন্মদিনে নিজের কবিতা শোনাতে বললেই বাবার মাথা ধরে ওঠে।

বাবা যখন ছোটো, তখন ভারি রোগে ভুগত। কেবলি ঠাণ্ডা লাগত। কখনো হাঁচি, কখনো কাসি, কখনো গলায় ব্যথা, কখনো কানে। শেষ পর্যন্ত তাকে যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল তার দরজায় সাইনবোর্ড লটকানো: 'কান গলা নাক।'

'ওটা কি ডাক্তারের উপাধি নাকি?' ঠাকুর্দা ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা। ওঁরা বললেন:

'না, কান গলা নাকের অসুখ এখানে দেখা হয়। বেশি বকিস না!'

বাবার কান গলা নাক দেখে ডাক্তার বললে অপারেশন করতে হবে। মস্কোয় এল বাবা। গলার বিচি কাটতে হবে।

ভয়ানক বুড়ো, ভয়ানক কড়া, ভয়ানক পাকাচুলো প্রফেসর বললে:

'খোকা হাঁ করো তো!'

বাবা হাঁ করতেই প্রফেসর ধন্যবাদটুকুও না জানিয়ে সোজা হাত চালিয়ে দিলে গলার মধ্যে, একেবারে ভেতর দিকে কী সব টেপাটিপি করতে লাগল। বেশ ব্যথা করছিল, বিশ্রী লাগছিল। তাই 'এ-এ্যাই পেয়েছি এবার বাছাধন' ব'লে প্রফেসর আরো জোরে টিপুনি দিতেই — চেঁচিয়ে হাত সরিয়ে নিলে মুখ থেকে, সে হাত ঢোকবার সময় যেমন আচমকা ঢুকেছিল, বেরুল আরো আচমকা। সবাই দেখলে তার বুড়ো আঙুলে রক্ত। একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল সবাই। প্রফেসর বললে:

'আইডিন!'

আইডিন এল, বুড়ো আঙুলে আইডিন লাগালে প্রফেসর। তারপর বললে:

'তুলো ব্যান্ডেজ!'

তুলো ব্যান্ডেজও এল। নিজেই এক হাতে বুড়ো আঙুলে ব্যান্ডেজ করলে তারপর শান্ত গলায় বললে:

'চল্লিশ বছর কাজ করছি, কামড় খেলাম এই প্রথম। যার ইচ্ছে ছেলেটার অপারেশন করুক। বাস, আমি চললাম।'

এরপর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে চলে গেল প্রফেসর। ঠাকুর্দা তখন ভয়ানক চটে গেলেন বাবার ওপর। বললেন:

'মস্কোয় নিয়ে আসা হল তোকে! তোর রোগ সারাচ্ছে, আর কী লাগিয়েছিস তুই? সাবধান, পাশেই দাঁতের ডাক্তারের ঘর। ডাক্তারকে কামড়ালেই ছেলেদের ওখানে নিয়ে গিয়ে দাঁত তুলে ফেলা হয়। আগে ওখানেই যাবার সাধ হয়েছে বুঝি? এদিকে আমি কিনা আবার ভাবছিলাম অপারেশনের পর আইসক্রীম কিনে দেব তোকে!'

আইসক্রীমের কথা শুনে ভাবনা হল বাবার। আইসক্রীম তো তাকে দেওয়া হত না, সবাই ভয় পেত কানে নাকে গলায় ঠাণ্ডা লাগবে। ওদিকে আইসক্রীমের ওপর বাবার ছিল ভারি লোভ। বাবাকে বলা হয়েছিল, অপারেশনের পর সব ছেলেকেই আইসক্রীম দেওয়া হয়, সেটা নাকি খুবই উপকারী, রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তাতে। সে সময় সত্যি ক'রে তাই করা হত। তাই আইসক্রীমের কথা ভেবে বাবা বললে:

'আর কখনো করব না...'

তাহলেও যে ছোকরা ডাক্তারটি অপারেশন করছিল সে হুঁশিয়ার ক'রে দিলে:

'মনে রাখিস, কথা দিচ্ছিস তো?'

বাবা ফের বললে:

'আর কখনো করব না…'

হেলান চেয়ারে বসিয়ে বাবার হাত পা চেপে ধরা হল। সেটা কামড়ে দিয়েছিল বলে নয়। সব ছেলেকেই অমনি চেপে ধরা হয়, যাতে ডাক্তারের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। ভারি যন্ত্রণা হচ্ছিল বাবার, কিন্তু আইসক্রীমের কথা ভেবে সব সহ্য ক'রে গেল। শেষ কালে ডাক্তার বললে:

'বাস! বাহাদুর ছেলে! কাঁদলেও না।'

ভারি আনন্দ হয়েছিল বাবার। কিন্তু ডাক্তার বলে উঠল:

'যাঃ, আরো এক টুকরো রয়ে গেছে দেখছি! আরেকটু সইতে পারবি তো?'

'পারব,' ব'লে বাবা ফের আইসক্রীমের কথা ভাবতে লাগল।

'যাক,' বললে ডাক্তার, 'এবার খালাস! বাহাদুর ছেলে! সত্যিই কাঁদলে না দেখছি! এবার আইসক্রীম খেতে পারিস। কোন আইসক্রীম ভালোবাসিস?'

'ক্রীম আইসক্রীম,' ব'লে বাবা তাকিয়ে দেখল ঠাকুর্দার দিকে, ঠাকুর্দা কিন্তু তখনো রেগে আছেন বাবার ওপর। বললেন:

'বিনা আইসক্রীমেই চলবে! শিক্ষা হোক, কামড়াতে যেন না যায়।'

এতক্ষণে আইসক্রীম পাওয়া যাবে না শুনে বাবা আর পারলে না, কেঁদে ফেললে। সবারই মায়া হচ্ছিল, ঠাকুর্দা কিন্তু টললেন না। বাবার এমন অভিমান হয়েছিল যে ঘটনাটা এখনো পর্যন্ত তার মনে আছে। আর তারপর থেকে ক্রীম, চকোলেট, বেরি — কত রকম আইসক্রীম বাবা তো কতবারই খেয়েছে, কিন্তু অপারেশনের পর তখন যে আইসক্রীমটি পাবার কথা ছিল, তা না পাওয়ার দুঃখ বাবার এখনো যায় নি।

এরপর থেকে রোগ কমে গেল বাবার। তেমন হাঁচি নেই, কাসি নেই, গলার ব্যথা এমন কি কানের ব্যথাও তেমন করত না।

অপারেশনে খুবই ভালো ফল দিয়েছিল। বাবা বুঝলে, আগে কিছুটা সহ্য করতে পারলে পরে ভালো হয়। এরপর আরো নানা রকম ডাক্তার অনেকবার কাটাকুটি করেছে নানা রকম, সূঁই ফুটিয়েছে, কিন্তু তার জন্যে আর কখনো কাউকে বাবা কামড়ায় নি। জানত, ওগুলো তারই উপকারের জন্যেই। শুধু কারো ভরসায় সে আর থাকত না, নিজের আইসক্রীমটি কিনে নিত নিজেই। কেননা আজো পর্যন্ত বাবা আইসক্রীম ভালোবাসে খুবই।

বাবা যখন ছোটো, তখন প্রায়ই একটা প্রশ্ন শুনতে হত তাকে। লোকে জিজ্ঞেস করত: ‘বড়ো হয়ে কী হবি বল তো?’ জবাব দিতে বাবার একটুও দেরি হত না। তবে প্রতিবারেই সে জবাব হত আলাদা আলাদা। প্রথম দিকে বাবার ইচ্ছে ছিল রাতের চৌকিদার হবে। ভারি ভালো লাগত যে সবাই ঘুমোচ্ছে, কিন্তু চৌকিদারের ঘুম নেই। তাছাড়া চৌকিদার যে কাঠের হাতুড়ি পিটিয়ে টহল দিয়ে যেত সেটাও ভারি ভালো লাগত তার। সবাই যখন ঘুমুচ্ছে, তখন যে আওয়াজ করা যাবে এতে ভারি আনন্দ লাগত বাবার। পাকাপাকি বাবা ঠিক ক’রে ফেললে যে বড়ো হয়ে রাতের চৌকিদারই সে হবে। এই সময় সুন্দর একটি সবুজ ঠেলা বাক্স সমেত দেখা দিল এক আইসক্রীম ফেরিওয়ালা। গাড়িও ঠেলা যাবে, আইসক্রীমও খাওয়া যাবে!

'একটা ক'রে আইসক্রীম বিক্রি করব, একটা ক'রে খাব,' বাবা ভাবলে, 'আর ছোটো খোকাখুকু দেখলে দিয়ে দেব বিনা পয়সাতেই।'

ছেলে আইসক্রীম ফিরি করবে শুনে ছোট্ট বাবার মা-বাবারা ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছিল তারা। বাবা কিন্তু এই মজাদার সুস্বাদু পেশাটাকে আঁকড়েই রইল মনে মনে। এই সময় হঠাৎ একদিন রেল স্টেশনে এক আশ্চর্য লোক দেখলে বাবা। লোকটা সারাক্ষণ কেবল ওয়াগন আর ইঞ্জিন নিয়ে খেলছে। সে খেলা খেলনা নিয়ে নয়, সত্যিকারের ইঞ্জিন নিয়ে! লাফিয়ে চত্বরে নামছে, ঢুকে যাচ্ছে ওয়াগনের তলায়, অপূর্ব কী এক খেলা চালাচ্ছে।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করলে বাবা।

জবাব এল, 'রেলের খালাসি, ওয়াগনের আঙটা লাগায় ও।'

সঙ্গে সঙ্গে বাবা শেষ পর্যন্ত বুঝে নিলে কী সে হবে। ভেবে দ্যাখো একবার! ওয়াগনের আঙটা লাগাচ্ছি আর খুলছি! দুনিয়ায় এর চেয়ে চমৎকার আর আছে কিছু? জানা কথা, থাকতেই পারে না। বাবা যখন ঘোষণা করলে যে সে রেলের খালাসি হবে, তখন কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল:

'আর আইসক্রীম?'

ভাবনায় পড়ল বাবা। রেলের খালাসি হবে তাতে বাবার কোনো সন্দেহই নেই, কিন্তু আইসক্রীম ভরা সবুজ বাক্সটাও ছেড়ে দিতে মন চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বার করলে বাবা। ঘোষণা করলে:

'খালাসি আইসক্রীমওয়ালা দুই-ই হব!'

ভারি তাজ্জব ব্যাপার, কিন্তু ছোট্ট বাবা বুঝিয়ে দিলে:

'তাতে আর মুশকিল কী? সকালে আইসক্রীম নিয়ে বেরুব, ঘুরে ঘুরে তারপর ছুটে যাব স্টেশনে। সেখানে ওয়াগনে আঙটা লাগাব। ফের ছুটে যাব আইসক্রীম নিয়ে। তারপর ফের চলে আসব স্টেশনে ওয়াগনের আঙটা খুলব, আবার যাব আইসক্রীমে। এই চলবে। গাড়িটা রাখব স্টেশনের কাছেই। আঙটা খোলাখুলির জন্যে বেশি দূর ছোটাছুটি করতে হবে না।'

সবাই খুব হেসে উঠল। ছোট্ট বাবা তখন রেগে গিয়ে জানিয়ে দিলে:

'তোমরা যদি হাসাহাসি করো তাহলে ব'লে দিচ্ছি, রাতের চৌকিদারিও ছাড়ব না। রাত তো আমার ফাঁকা। চৌকিদারি হাতুড়ি ঠুকতেও শিখে গিয়েছি। একজন চৌকিদার আমায় দেখিয়ে দিয়েছে...'

এইভাবেই সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু শীগগিরই পাইলট হবার সাধ হল বাবার। পরে ইচ্ছে হল অভিনেতা হবে, থিয়েটার করবে। পরে একবার ঠাকুর্দার সঙ্গে একটা কারখানা দেখতে

গিয়ে ঠিক করলে টার্নার হবে। তাছাড়াও জাহাজের মাল্লা হবার ইচ্ছে হয়েছিল বাবার। তা না হলে অন্তত সশব্দে চাবুক চালিয়ে এক পাল গরু নিয়ে রাখালি করবে। একবার তার জীবনের পরম কামনা হয়ে উঠেছিল কুকুর হবে। সারা দিন সে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াল, লোক দেখে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকলে, একজন বুড়ি তার মাথায় হাত বোলাতে গেলে বাবা কামড়ে দেবারও চেষ্টা করলে। কুকুরের ডাকটা বাবার বেশ হত, কিন্তু কুকুরের মতো পা দিয়ে কান চুলকানোটা বাবা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও আয়ত্ত করতে পারলে না। ভালো ক'রে আয়ত্ত করার জন্যে সে বাড়ির বাইরে গিয়ে তুজিক কুকুরের পাশেই বসল। রাস্তা দিয়ে তখন অচেনা এক সৈন্য যাচ্ছিল। থেমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে বাবাকে দেখলে সে, তারপর জিজ্ঞেস করলে:

'কী করছিস রে খোকা?'

'কুকুর হচ্ছি,' বললে ছোট্ট বাবা।

অচেনা লোকটা তখন জিজ্ঞেস করলে:

'মানুষ হতে চাস না বুঝি?'

'মানুষ তো আমি অনেকদিন আগেই হয়েছি!' বললে বাবা।

লোকটা বললে:

'কুকুরই যখন হতে পারছিস না তখন মানুষ আর কোথায় হলি? ওকে কি আর মানুষ বলে?'

'তবে কাকে বলে?' জিজ্ঞেস করলে বাবা।

'তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ!' ব'লে চলে গেল লোকটা। মোটেই ঠাট্টা করে নি সে, এতটুকু হাসেও নি। কিন্তু ছোট্ট বাবার কেন জানি ভারি লজ্জা হল। ভাবতে শুরু করলে বাবা। কেবলি ভাবে আর ভাবে, আর যত ভাবে তত লজ্জা হয়। সৈন্যটা তাকে কিছুই বুঝিয়ে বলে নি। কিন্তু নিজেই সে হঠাৎ একদিন বুঝলে রোজ রোজ নতুন নতুন পেশার পেছনে ছোটাটা কোনো কাজের কথা নয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এখনো সে ছোটো, কী যে সে হবে সেটা নিজেই সে এখনো জানে না। প্রশ্নটা ফের কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলে সৈন্যের কথাটা মনে পড়ে যেত বাবার। বলত:

'মানুষ হব!'

তাতে কিন্তু কেউ হাসত না। ছোট্ট বাবা বুঝলে যে এইটেই সবচেয়ে সঠিক উত্তর। সবার আগে হতে হবে খাঁটি মানুষ। পাইলটই হোক কি টার্নারই হোক, রাখালই হোক কি অভিনেতা হোক — সকলের পক্ষেই সেইটেই বড়ো কথা। আর মানুষ হলে পা দিয়ে কান চুলকানোর কোনো দরকারই হয় না।

বাবা যখন ছোটো, তখন নানা রকম খেলনা কিনে দেওয়া হত বাবাকে। বল। লোটো। দম দেওয়া মোটর গাড়ি। হঠাৎ বাড়িতে কেনা হল পিয়ানো। খেলনা নয়, সত্যিকারের মস্ত এক পিয়ানো, চকচকে কালো তার ঢাকনা। ঘরের আধখানাই জুড়ে গেল তাতে।

ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা:

'বাবা তুমি পিয়ানো বাজাতে পারো?'

ঠাকুর্দা বললেন:

'না রে, পারি না।'

তখন ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা:

'আর মা, তুমি বাজাতে পারো?'

'উহুঁ,' ঠাকুমা বললেন, 'পারি না।'

'তাহলে কে বাজাবে?' জিজ্ঞেস করলে ছোট্ট বাবা।

ঠাকুমা ঠাকুর্দা দুজনেই সমস্বরে বলে উঠলেন:

'তুই!'

'কিন্তু আমিও যে জানি না,' বললে বাবা।

'তুই শিখবি,' বললেন ঠাকুর্দা।

ঠাকুমা যোগ করলেন:

'মাস্টারণীর নাম নাদেজদা ফিওদরভনা।'

তখন বাবার খেয়াল হল কত বড়ো উপহার সে পেয়েছে। আগে তো কখনো মাস্টার রাখা হয় নি তার জন্যে, নতুন নতুন খেলনা যা পেয়েছে তা নিয়ে নিজে নিজেই সে খেলেছে।

বাজনার মাস্টারণী নাদেজদা ফিওদরভনা এলেন। চুপচাপ বয়স্কা মহিলা। কী ক'রে পিয়ানো বাজাতে হয় তা তিনি বাবাকে দেখিয়ে দিলেন। স্বরগুলো শিখিয়ে দিলেন তিনি, সাতটা স্বর: সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। চট ক'রেই এগুলো মুখস্থ হয়ে গেল বাবার। পদ্ধতিটা এই রকম। কাগজ পেনসিল নিয়ে বাবা বসে বলত:

'সা — কাক পক্ষীর বাসা,' এই ব'লে গাছ আঁকত বাবা, গাছের ওপর বাসা, বাসায় ছানা, পাশে কাক। 'রে — ঘুম দিচ্ছে কুকুরে।' আঁকত উঠোন, উঠোনে খোপ, খোপের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কুকুর। এমনি ক'রেই এঁকে যেত: গা — ডুব দি গে যা; মা — কিনে আন পাজামা; পা — গাধা টানছে ধোপা; ধা — সুর চাই সব সাধা; নি — সাত রাজ্যের রাণী। এ জিনিসটা বাবার খুবই ভালো লেগেছিল। কিন্তু শীগগিরই বাবা টের পেলে যে বাজনা শেখা অত সোজা নয়। বার দশেক ক'রে কেবল একটা স্বরই বাজানো — এতে বিরক্তি ধ'রে গেল বাবার, এর চেয়ে অনেক ভালো বই পড়া, বেড়ানো, এমন কি কিছুই না করা। সপ্তাহ দুয়েক পরে বাজনায় বাবার একই অচ্ছেদ্ধা হল যে পিয়ানোটাকে দু চক্ষে দেখতেই পারত না। নাদেজদা ফিওদরভনা প্রথম দিকে তারিফ করতেন বাবার, এবার তিনি কেবল আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে শুরু করলেন।

'সত্যিই তোর মন লাগছে না বাজনায়?' জিজ্ঞেস করতেন বাবাকে।

প্রতিবারই বাবা বলত:

'না, মন লাগছে না।' আর ভাবত মাস্টারণী রাগ ক'রে শেখানো বন্ধ করবেন। কিন্তু সেটা আর ঘটল না।

ছোট্ট বাবাকে খুব ধমক দিলেন ঠাকুর্দা ঠাকুমা। বললেন:

'দ্যাখ তো, কী সুন্দর পিয়ানো কিনে দিলাম তোকে। মাস্টার রেখে দিয়েছি... অথচ বাজনায় তোর মন নেই। লজ্জা করে না?'

ঠাকুর্দা আরো বললেন:

'এখন বলছে গান শিখব না, পরে বলবে ইশকুলে যাব না, পরে বলবে কাজও করব না। এমন আলসেকে ছোটো থেকেই কাজের তালিম দিতে হয়! আমার কাছে বাজনা শিখবি তুই!'

ঠাকুমা যোগ করলেন:

'আমায় যদি কেউ অমন ছেলেবেলায় পিয়ানো বাজাতে শেখাত, তাহলে ভাগ্যি মানতাম।'

ছোট্ট বাবা তখন বললে:

'গড় করছি তোমাদের, কিন্তু বাজনা আর আমি শিখছি না।'

নাদেজদা ফিওদরভনা যখন এলেন, দেখা গেল বাবা নেই। সারা বাড়ি খোঁজা হল, রাস্তাঘাট দেখা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও। আর ঠিক এক ঘণ্টা বাদে খাটের তল থেকে নিজেই বেরিয়ে এল বাবা, বললে:

'বিদায় নাদেজদা ফিওদরভনা।'

ঠাকুর্দা বললেন:

'শাস্তি দেব ওকে!'

ঠাকুমা বললেন:

'আমি ওকে দেব আরো এক দফা!'

বাবা কিন্তু বলে দিলে:

'যত খুশি শাস্তি দাও, কিন্তু পিয়ানো বাজাতে আর বলো না।'

ব'লেই কেঁদে ফেললে। ছোটো তো! পিয়ানো বাজাতে কিছুতেই মন চাইছিল না। গানের মাস্টারণী নাদেজদা ফিওদরভনা তখন বললেন:

'বাজনা শুনে লোকের আনন্দ হবার কথা। আমার ছাত্ররা কেউ আমার কাছ থেকে পালিয়ে খাটের তলায় লুকোয় না। পুরো এক ঘণ্টা খাটের তলে শুয়ে থাকতেই যদি ওর বেশি ভালো লাগে, তার মানে বাজনা শিখতে ও চায় না। আর যদি না চায়, জেদ ক'রে লাভ নেই। বড়ো

হয়ে হয়ত নিজেই আফসোস করবে। বিদায়! আমার কাছ থেকে পালিয়ে যারা খাটের তলে লুকোয় না, তাদের কাছেই আমি যাব।'

এই ব'লে চলে গেলেন। আর আসেন নি। ঠাকুর্দা কিন্তু ছোট্ট বাবাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন নি। ঠাকুমা দেন আলাদা আরেক দফা শাস্তি। তারপর বহুদিন মস্ত পিয়ানোটার দিকে বাবা চাইতেন মুখ ভার ক'রে।

বড়ো হয়ে বাবা টের পায় যে তার সুরবোধ নেই। একটা গানও সে আজো পর্যন্ত সঠিকভাবে গাইতে পারে না। পিয়ানো বাজানো শিখলেও নিশ্চয় বাজাত খুবই খারাপ।

সত্যি, সব ছেলেমেয়েকেই কি আর পিয়ানো বাজানো শেখাতে হয়।

বাবা যখন ছোটো, তখন মুখরোচক সবকিছুতেই বাবার ভারি লোভ ছিল। ভারি ভালোবাসত সসেজ। ভালোবাসত পনীর। ভালোবাসত কাটলেট, কিন্তু রুটি কিছুতেই পছন্দ হত না, অথচ কেবলি সবাই বলত, 'শুধু শুধু খাস নে, রুটির সঙ্গে খা!'

আর রুটি তো তেমন খেতে ভালো নয়। একদম লোভ হয় না খেতে। ছোট্ট বোকা বাবা তাই ভাবত। চায়ের সময়, কি দুপুরের খাওয়ার সময় রুটি বাবা প্রায় ছুঁতই না। এমন কি রাতের খাবারের সময়ও নয়। পাঁউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গুলি পাকাত সে। ওপরকার চটাগুলো ফেলে রাখত টেবলেই। রুটি লুকিয়ে রাখত টেবল-ক্লথের তলায়। মিছে ক'রে বলত, সব

রুটিই নাকি তার খাওয়া হয়ে গেছে। মনে মনে বাবা ঠিক ক'রে নিয়েছিল, বড়ো যখন হবে তখন রুটি সে আর ছোঁবেই না, নিজের ছেলেমেয়েদেরও সে কখনো পেড়াপীড়ি করবে না রুটি খাবার জন্যে। ভাবত:

'আহ, রুটি বাদ দিয়ে খাওয়া, কী তোফা! কী আছে আজ সকালের খাবার? না, পনীর। বিনা রুটিতে পনীর খাব! সসেজও খাব বিনা রুটিতে! রুটি ছাড়া দুপুরের খাওয়া কী চমৎকারই না হবে, রুটি ছাড়া সুপ, রুটি ছাড়া কাটলেট — এই না হলে জীবন! রাতের খাবার — তাতেও রুটি নেই। কাল সকালেও চা খাবার সময় আর রুটি খেতে হবে না এই কথা জেনে ঘুমতে যাওয়া, সে যে কী আরাম!' এই ছিল ছোট্ট বাবার স্বপ্ন। ভয়ানক ইচ্ছে হত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, আরো কত লোকে বাবাকে বলতেন ভুল করছে সে, ফল হত না। বলতেন রুটি খুব উপকারী জিনিস। বলতেন, রুটি খেতে চায় না কেবল খারাপ ছেলেরা, বোকা ছেলেরা। বলতেন, রুটি খাওয়া ছেড়ে দিলে লোকের ব্যারাম ধরে। বলতেন, রুটি না খেলে বাবাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুতেই রুটি আর বাবার ভালো লাগত না।

একদিন ভয়ংকর এক ব্যাপার হল। ছোট্ট বাবার ছিল এক বুড়ি আয়া। বাবাকে ভারি ভালোবাসত সে, কিন্তু খেতে ব'সে ঝোঁক ধরলে রেগে যেত ভয়ানক। ঠাকুর্দা ঠাকুমা বাড়ি নেই। ছোট্ট বাবা ওঁদের ছাড়াই রাতের খাবার খেতে বসেছে, কিন্তু রুটি কিছুতেই ছোঁবে না। আয়া তখন বললে:

'শীগগির রুটি মুখে তোল বলছি, নইলে কিছুই পাবি না!'

ছোট্ট বাবা বললে:

'রুটি খাব না।'

আয়া বললে:

'খেতেই হবে!'

ছোট্ট বাবা বললে:

'খাব না বলছি!'

ব'লেই রুটি ছুঁড়ে ফেললে মেঝেয়। আয়া তখন এমন চটে গেল যে একটা কথাও বলতে পারলে না। সে বড়ো ভয়ংকর অবস্থা। থমথমে চোখে তাকিয়ে আছে, মুখে কথা নেই।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বললে:

'তুই ভাবছিস, ওটা রুটি, না? কী যে তুই ছুঁড়ে ফেললি জানিস না, বলছি শোন। আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন এক টুকরো রুটির জন্যে সারা দিন হাঁস চরাতাম। একবারকার শীতে আমাদের একেবারেই রুটি ছিল না। আমার ভাই — সেও বাচ্চা — না খেয়ে মারা যায়। এক

টুকরো থাকলে তখন সে বেঁচে যেত। লেখাপড়া শিখছিস, আর কী ক'রে রুটি আসে সেটা শিখছিস না। এই রুটির জন্যে কত খাটছে লোকে, ফসল ফলাচ্ছে আর তুই কিনা তা মাটিতে ফেলে দিলি! ছি-ছি! তোর মুখ দেখতেও ইচ্ছে করছে না!'

শুতে গেল বাবা, কিন্তু ভালো ঘুম হল না। ভয়ঙ্কর কী সব স্বপ্ন দেখলে সে। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন শুনল, সারা দিন সে এক টুকরো রুটিও পাবে না — এই তার শাস্তি। শাস্তি হিসেবে প্রায়ই মিষ্টি বন্ধ হত তার, মাঝে মাঝে দুপুরের খাওয়া বন্ধ, কিন্তু রুটি বন্ধ জীবনে তার এই প্রথম। এ বুদ্ধিটা আয়ার দেওয়া। খাসা বুদ্ধি। সকালে ছোট্ট বাবা পনীর খেলে বিনা রুটিতে। ভারি খেতে ভালো। চট ক'রে সবটাই খেয়ে নিলে সে। কিন্তু টেবল থেকে উঠল বেশ খিদে নিয়েই। রুটি ছাড়া পেট আর ভরে না। দুপুরের খাওয়ার জন্যে তর সইছিল না তার। কিন্তু রুটি ছাড়া কাটলেট খেয়েও কিছু ফল হল না। সারা দিন কেবলি মনে হচ্ছিল রুটি খাই। সন্ধ্যার খাওয়ার সময় ছিল ওমলেট। বিনা রুটিতে একেবারেই মুখে রুচল না সেটা।

সবাই হাসাহাসি করতে লাগল বাবাকে নিয়ে। বললে, সারা বছর নাকি তার রুটি বন্ধ। তাহলেও সকালে অবিশ্যি রুটি দেওয়া হল তাকে। আর কী মিষ্টি সেই রুটি। কেউ কিছু বললে না, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল কী ভাবে সে রুটি খাচ্ছে। ভারি লজ্জা হয়েছিল বাবার। সেই থেকে বাবা রুটি খাওয়া ধরে। কখনো আর রুটি ছুঁড়ে ফেলে নি মেঝের ওপর।

বাবা যখন ছোটো, তখন কথায় কথায় রাগ হত তার। রাগ করত এক সঙ্গে সক্কলের ওপর, আলাদা আলাদা প্রত্যেকের ওপর। যদি বলো: 'এত কম খাস যে?' অমনি রাগ। যদি বলো: 'এত বেশি খাস যে?' তাতেও রাগ।

ঠাকুমার ওপর রাগ হত, কেননা ঠাকুমাকে কী যেন একটা কথা বলতে গিয়েছিল বাবা, কিন্তু ঠাকুমা কাজে ব্যস্ত থাকায় সে দিকে কান দেন নি। রাগ করত ঠাকুর্দার ওপর, কেননা ও নিজেই কী একটা জিনিসে ব্যস্ত আর সেই সময় কিনা ঠাকুর্দা ওকে কী একটা বলতে এসেছেন। ঠাকুর্দা ঠাকুমা যখন নেমন্তন্নে কি থিয়েটারে যেতেন, ছোট্ট বাবা তখন রাগ করত, কাঁদতে বসত।

জেদ ধরত ঠাকুর্দা ঠাকুমা কোথাও যেতে পারেন না, বাড়িতেই থাকবেন। আর নিজেই যখন আবার সার্কাস দেখার ঝোঁক ধরত, তখন তো আরো আকুল হয়ে উঠত তার কান্না। ওকে ঘরে বসে থাকতে বলা হয়েছে বলে রাগ করত। রাগ করত নিজের ভাই ভিতিয়া কাকুর ওপর — ভিতিয়া কাকু নিজেও তখন ছোট্ট, কিন্তু বাবার রাগ হয়ে যেত কারণ বাবার সঙ্গে সে কথা কইত না। কেবল হাসত ভিতিয়া কাকু, আর নিজের পা'টা ধরে চুষত। ভিতিয়া কাকু তখন এতই ছোটো যে কেবল একটা কথাই বলত: 'বা-ব্বা-ব্বা...' বাবা কিন্তু তাতেও রাগ করত। যদি পিসি কখনো বেড়াতে আসত, তাহলে পিসির ওপরেও রাগ করত বাবা। যদি বেড়াতে আসত জেঠু, তাহলে রাগ করত জেঠুর ওপর। যদি জেঠু আর পিসি দুজনেই একসঙ্গে আসত, তাহলে দুজনের ওপরই তার রাগ হত। কখনো মনে হত পিসি ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। কখনো মনে হত জেঠু ওর সঙ্গে কথাই কইতে চাইছে না। নয়ত অমনি কিছু একটা ভেবে বসত। কেন জানি ছোট্ট বাবা ভাবত, দুনিয়ায় সে ছাড়া বুঝি আর মানুষ নেই।

বাবার যদি কিছু বলবার ইচ্ছে হয়, তাহলে আর সবাইকে যেন চুপ ক'রে থাকতে হবে। আর যদি চুপ ক'রে থাকার ইচ্ছে হয়, তাহলে কেউ বাবার সঙ্গে যেন কথা না বলে।

বাবা যদি কখনো মিউ মিউ ক'রে বেড়াল ডাকে, কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে, শুয়োর ডাক নকল ক'রে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ওঠে, কোঁকর-কোঁ ক'রে ওঠে মোরগের মতো বা গরুর ডাক ডাকে, তাহলে সবাইকে সব কাজ ফেলে শুনতে হবে কী খাসা ও ডাকতে পারে। ছোট্ট বাবা কিছুতেই এইটে বুঝত না যে ছোটো হোক বড়ো হোক, অন্য লোকেরাও তার চেয়ে কিছু তুচ্ছ নয়। আর কেউ যদি তার কথায় আপত্তি জানাত বা ভর্ৎসনা করত, অমনি রাগ হয়ে যেত বাবার। বাবার কাছে সেটা খুবই অসহ্য। ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ ঘোঁজ ক'রে চলে যেত বাবা।

কারো না কারো ওপর রাগ, কারো সঙ্গে ঝগড়া আর সবার ওপর অভিমান তার লেগেই থাকত। সকাল থেকে সন্ধে অবধি কেবলি তাকে শান্ত করতে হত, বোঝাতে হত। সকালে চোখ খুলতে না খুলতেই রাগ হয়ে যেত সূর্যের ওপর, কেননা সূর্যটা তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। তারপর সন্ধে পর্যন্ত সবকিছুর ওপরেই তার রাগ হতে হতে শেষ পর্যন্ত যখন ঘুমত, তখনো স্বপ্নেও কার ওপর যেন ঠোঁট ফোলাত, ঝগড়া করত কারো সঙ্গে। কিন্তু অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলবার সময়টাতেই হত সবচেয়ে খারাপ। ঝোঁক ধরত, যে খেলাটা বাবার ভালো লেগেছে শুধু সেই খেলাটাই খেলতে হবে। খেলত শুধু নিজের পছন্দমতো একদল ছেলের সঙ্গে, বাকিদের সঙ্গে কিছুতেই খেলত না। তর্ক হলে সব সময় বাবার কথাই নাকি ঠিক। সবাইকে টিটকারি দিতে চাইত বাবা, কিন্তু ওকে নিয়ে কারো হাসাহাসি করা চলবে না। শেষ পর্যন্ত সবারই তাতে বিরক্ত ধ'রে গেল। সবাই ছোট্ট বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা শুরু ক'রে দিলে। ঘরে বাইরে সর্বত্র। ঘরে বলত:

'চা খাবি? তবে রাগ করিস না বাপু!'

'চল বেড়াতে যাই, তবে দোহাই বাপু, মুখ হাঁড়ি করিস না!'

'রাগ ক'রে বসে আছিস তো, নাকি এখনো রাগ হয় নি?'

'রাগ করতে হয় চটপট ক'রে নে, আমাদের সময় নেই!'

এই সব শুনে তক্ষুণি রাগ হয়ে যেত বাবার। আর বাইরের ছেলেরা তো সোজাসুজিই ক্ষেপাত। বলত:

'রাগ করেছে রাগুনী,' অমনি রাগ হয়ে যেত বাবার।

'দ্যাখ, দ্যাখ, ওকে যেই আঙুল দেখাব না, অমনি ওর রাগ হয়ে যাবে।'

বাবাকে যেই আঙুল দেখাত, অমনি রাগ হয়ে যেত বাবার। আর হো হো ক'রে হেসে উঠত সবাই। ছোট্ট বাবাকে অত সহজে ক্ষেপানো যায় দেখে ভারি মজা লাগত ছেলেদের। একেবারেই হয়ত জ্বালিয়ে মারত তাকে, কিন্তু দেখে কষ্ট হল একটা ছেলের। বয়সে সে একটু বড়ো। বললে:

'শোন বলি, রাগ করা ছেড়ে দে। দেখিস তখন কেউ আর তোর পেছনে লাগবে না।'

সে কথাটা মেনেছিল বাবা, অত বেশি আর রাগ করত না, ছেলেরাও তাকে ক্ষেপাত কম। তাহলেও রাগ করা তার এমনি অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে সে অভ্যেস যায় কেবল স্কুলে ভর্তি হয়ে। তাও পুরো নয়। এই বিচ্ছিরি অভ্যেসটার জন্যে পড়াশুনা, কাজকর্ম বা লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বে তার ক্ষতি কম হয় নি। আর ছেলেবেলায় যারা বাবাকে চিনত, তারা এখনো পর্যন্ত বাবাকে ক্ষেপাবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। কিন্তু এখন বাবা তাদের ওপর মোটেই রাগ করে না। প্রায় মোটেই রাগ করে না। মানে, তখনকার চেয়ে রাগ করে অনেক কম।

বাবা যখন ছোটো, তখন তার পানীয় ছিল দুধ, জল আর ক্যাস্টর অয়েল।

সবচেয়ে উপকারী অবশ্য ক্যাস্টর অয়েল। কিন্তু খেতে ভারি বিচ্ছিরি। ছোট্ট বাবার মনে হত বুঝি ক্যাস্টর অয়েলের চেয়ে বিচ্ছিরি জিনিস দুনিয়ায় নেই। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

একবার গ্রীষ্মকালে বাইরে খেলছে বাবা। দিনটা ভারি গরম। ছোটাছুটি করছিল, তাই ভয়ানক তেষ্টা পেল। বাড়ি ছুটে এল বাবা, কিন্তু বাড়ির লোকেরা তখন সবাই ভারি ব্যস্ত।

পিঠেপুলি ভাজা হচ্ছে, টেবলে ঢাকা পড়েছে, নিমন্ত্রিতদের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।

কাচের একটা পাত্র থেকে যে বাবা জল খেতে যাচ্ছে সেটা কারো নজরেই পড়ল না। জল ফুটিয়ে বরাবর ওই কাচের পাত্রটাতেই রাখা হত। বাবার সেটা জানা ছিল। ঢেলে সঙ্গে সঙ্গেই আধ গেলাস খেয়ে নিলে বাবা। খেতেই দম বন্ধ হয়ে এল। জলটার অমন দশা কেন সেটা কিছুতেই ভেবে পেল না সে।

ছোটো বাবার মনে হল যেন এক জ্যান্ত সজারু গিলেছে। পরে মনে হল জলই বটে ভালো কিন্তু কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেছে। ভয়ানক ভয় পেল সে, ভাবলে বুঝি মরেই যাবে। তাই আতঙ্কে এমন চেঁচাতে লাগল যে সবাই ছুটে এল।

কাশছে বাবা, দম আটকে আসছে, গলার ভেতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে সব। রোগীর মতো ছটফট করছে। কিন্তু কী হয়েছে কেউ বুঝতে পারছিল না।

ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন:

'অসুখ করেছে নিশ্চয়!'

ঠাকুর্দা বললেন:

'ঢঙ করছে!'

চ্যাঁচানি শুনে এই সময় ছুটে এল আয়া, সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলে। বললে:

'জল ভেবে খেয়েছে, পাত্রটায় যে ভোদকা ছিল!'

ভোদকার কথা শুনেই সবাই ফের চেঁচামেচি শুরু করলে।

'ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার!' বললেন ঠাকুমা।

'আচ্ছা ক'রে পিটুনি দাও!' বললেন ঠাকুর্দা।

'বরং কিছু একটা খেতে দাও!' বললে আয়া।

একটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে বাবা আস্তে ক'রে বললে:

'ভোদকা বোধ হয় খুবই উপকারী ওষুধ।'

কিন্তু এই সময় মাথা ঘুরতে লাগল বাবার, মাটির ওপর ব'সে পড়লে।
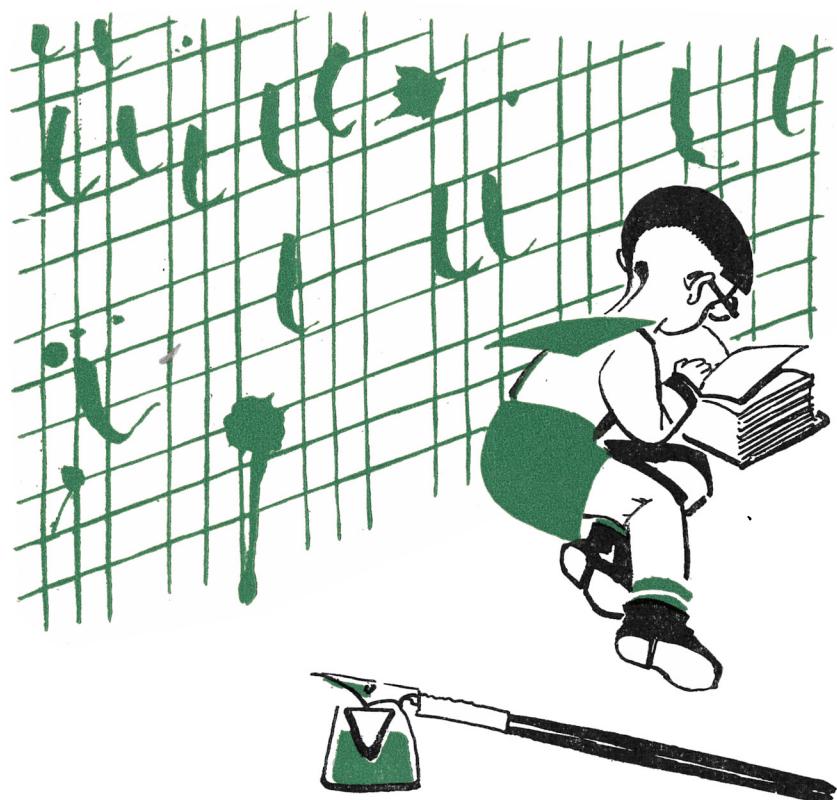
পরে আর কিছু তার মনে ছিল না। লোকের কাছ থেকে শোনে, সারা দিন নাকি সে ঘুমিয়েছে। সন্ধের দিকে একটু ভালো বোধ হয়। নিমন্ত্রিতরা এসে যখন ভোদকা খাচ্ছিল, তখন খাট থেকে শুয়ে শুয়ে সেটা দেখছিল বাবা। ভারি করুণা হচ্ছিল তার। বাবা তখন ভালোই টের পেয়েছে পরে ওদের কেমন দশা হবে। একজন অতিথিকে তো বাবা বলেই দিলে:

'ভারি বিচ্ছিরি জিনিস, খাবেন না!'

সকাল নাগাদ একদম ভালো হয়ে গেল বাবা। কিন্তু ওই কাচের পাত্রটা থেকে আর কখনো সে জল খেত না। আর এখনো ভোদকা দেখলেই কেমন যেন তার বিচ্ছিরি লাগে।

প্রায়ই এই গল্পটা শোনায় বাবা। বলে:

'সেই থেকে মদ আর আমি খাই নি!'

বাবা যখন ছোটো, তখন পড়তে শিখে যায় চট ক'রেই। শুধু বলা হত: এই হল 'আ' এই হল 'ব', ওতেই অক্ষর পরিচয় হয়ে যায় তার। ভারি মজার ব্যাপার। বই পড়তে শুরু করলে সে, ছবি দেখত। কিন্তু লিখতে চাইত না কিছুতেই। নিব লাগানো কলমটাকে ঠিকমতো ধরতে ইচ্ছে করত না। বেঠিকভাবেও যে ধরবে, সে ইচ্ছেও হত না। ইচ্ছে হত পড়বে, লিখতে ইচ্ছে হত না। পড়াটা ভারি মজার, লেখায় যে কোনো মজাই নেই।

ছোট্ট বাবার গুরুজনেরা বললে:

'না লিখলে পড়তেও পাবি না!'

আরো বললে:

'আগে দাঁড়ি আঁকা শেখ!'

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছোট্ট বাবার কানে কেবল এই এক কথা। বাবাও দাঁড়ি আঁকতে লাগল, তবে বড়োই বিতৃষ্ণায়।

আর কী বিচ্ছিরিই না দেখাত দাঁড়িগুলোকে। কোনোটা বাঁকা ট্যারা, কোনোটা কুঁজো। কোনোটা একেবারে খোঁড়া। ছোটো বাবার নিজের চোখেই খারাপ লাগত দেখতে।

হ্যাঁ, সোজা সোজা দাঁড়ি আঁকা তার হল না। তবে কালির ছোপগুলো হত দারুণ। অমন বড়ো বড়ো চমৎকার কালির ছোপ কেউ কখনো ফেলতে পারে নি। সবাই সেটা মানলে। অক্ষরগুলো যদি কালির ছোপ দিয়ে হত তাহলে ছোট্ট বাবার হাতের লেখা হত দুনিয়ায় সেরা।

একটা দাঁড়িও তার কখনো সমান হত না। কিন্তু প্রতি পাতায় জ্বলজ্বল করত বড়ো বড়ো চমৎকার চমৎকার ছোপ।

সবাই ছি-ছি করত, ধমক দিত, শাস্তিও বাদ যেত না। দুবার তিনবার ক'রে লিখতে হত একই জিনিস। কিন্তু যত লিখত ততই খারাপ হত দাঁড়িগুলো, তোফা দেখাত ছোপগুলোকে।

কিছুতেই বাবা বুঝত না কেন তাকে দাঁড়ি আঁকতে ব'লে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে। কেননা লোকে তো পড়ে অক্ষরই, দাঁড়ি নয়। তাই অক্ষর আঁকারই ইচ্ছে হত বাবার। কিন্তু লোকে বলত আগে ছোট ছোট দাঁড়ি আঁকতে না শিখলে নাকি অক্ষর আঁকা যায় না। এটা কিন্তু তার বিশ্বাস হয় নি। তারপর বাবা যখন ইশকুলে গেল, সবাই একেবারে অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে কী সুন্দর পড়ে আর কী বিচ্ছিরি হাতের লেখা। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

তারপর বহু বছর কেটেছে। বড়ো হয়েছে বাবা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পড়তেই বাবা ভালোবাসে, লিখতে মন চায় না। হাতের লেখা তার এতই খারাপ যে অনেকে ভাবে ঠাট্টা করছে।

আর প্রায়ই লজ্জায় পড়তে হয় বাবাকে।

কিছুদিন আগে ডাকঘরে বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়:

'কী ব্যাপার, লেখাপড়া বিশেষ করেন নি বুঝি?'

রাগ হয়ে গেল বাবার। বললে:

'করব না কেন, যথেষ্টই করেছি!'

‘কিন্তু এটা আপনার কী অক্ষর?’

‘এটা **উ**,’ মৃদুস্বরে বললে বাবা।

‘**উ**? এভাবে আবার **উ** লেখে কে?’

‘আমি লিখি...’ বাবা বললে আস্তে ক’রে।

সবাই হেসে উঠল।

কালির ছোপ না ফেলে সুন্দর ঝরঝরে হরফে লেখার জন্যে আজকাল কী ইচ্ছেই না করে বাবার! ঠিক ক’রে কলম ধরার কী সাধই না হয়! ঠিক ক’রে দাঁড়ি আঁকতে শেখে নি ব’লে কী আফসোসই না লাগে! কিন্তু এখন আর উপায় কী। নিজেরই তো দোষ।

বাবা যখন ছোটো, তখন তার ভাইটি ছিল আরো ছোটো।

এখন সে ভাইকে আমরা ডাকি ভিতিয়া কাকু, এখন সে ইঞ্জিনিয়র, নিজেরই এক ছেলে আছে, তারও নাম ভিতিয়া।

তখন কিন্তু ভিতিয়া কাকু ছিল এক ফোঁটা এক বাচ্চা। সবে হাঁটতে শিখেছে। হামাগুড়ি দেওয়া তখনো ছাড়ে নি। কখনো কখনো আবার স্রেফ মাটিতেই বসে পড়ে। তাই একা একা ছেড়ে দেওয়া তাকে চলত না। খুবই সে ছোটো।

একদিন ছোট্ট বাবা আর আরো ছোট্ট ভিতিয়া কাকু খেলছে আঙিনায়। মাত্র মিনিট খানেকের জন্যে ওদের একা রেখে গেছে সবাই। আর সেই এক মিনিটের মধ্যেই ফটকের ওধারে গড়িয়ে গেল বল। বলের পেছনে বাবা ছুটল, বাবার পেছনে ভিতিয়া কাকু।

ফটকের পরই ঢিবি নেমে গেছে। ঢিবি বেয়ে গড়াতে লাগল বল, বলের পেছন পেছন নামতে লাগল বাবা। বাবার পেছন পেছন ভিতিয়া কাকু।

ঢিবির নিচে রাস্তা। বলটা সেখানে থামল। বাবা এসে ধরলে বলটাকে, ছোটো ভিতিয়া কাকুও এসে নাগাল ধরলে বাবার।

বলটা সবচেয়ে ক্ষুদে হলেও কিছুই হয় নি তার। ছোট্ট বাবা কিন্তু খানিকটা হাঁপিয়ে গিয়েছিল। আর ভিতিয়া কাকুর তো কথাই নেই — হাঁটতে শিখেছে তো সবে! সোজা রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল সে।

ঠিক সেই সময় রাস্তায় ধুলো উঠতে দেখা গেল, গমগমিয়ে উঠল গান, ঘোড়সওয়াররা আসছে। আসছে তারা জোর ঘোড়া ছুটিয়ে। অনেক দিন আগেকার কথা। সবে তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

ছোট্ট বাবা ভালোই জানত যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তাহলেও ভয় হল তার। বল ছুঁড়ে ফেলে ভিতিয়া কাকুকে রাস্তাতেই ফেলে রেখে বাড়ি পালাল সে।

ছোট্ট ভিতিয়া কাকু কিন্তু মাটির ওপর ব'সে ব'সে বল নিয়ে খেলছে। ঘোড়া কি সৈন্যে তার ভয় নেই। বলতে কি কোনো কিছুতেই কোনো ভয় তার ছিল না। একেবারেই ছোট্ট কিনা।

সওয়ারীরা এগিয়ে এল ভিতিয়া কাকুর কাছে। সবার আগে শাদা ঘোড়ায় চাপা কম্যাণ্ডার।

'রোখকে!' হাঁক দিল সে, ঘোড়া থেকে নেমে কোলে তুলে নিলে ভিতিয়া কাকুকে। লোফালুফি করতে লাগল শূন্যে ছুঁড়ে, হাসতে লাগল।

'কী রে, কেমন চলছে?' জিজ্ঞেস করলে সে। ভিতিয়া কাকুও হেসে বলটা এগিয়ে দিলে তার দিকে। ওদিকে ঢিবি থেকে তখন ছুটে নামছে ঠাকুমা, ঠাকুর্দা আর ছোট্ট বাবা।

ঠাকুমা চ্যাঁচাচ্ছেন:

'ছেলে কোথায় গেল, আমার ছেলে?'

ঠাকুর্দা বলছেন:

'থামো, চেঁচিও না!'

আর ছোট্ট বাবা অঝোরে কাঁদছে।

কম্যাণ্ডার তখন বললে:

‘এই নিন আপনার ছেলে! বাহাদুর ছেলে! ঘোড়া, মানুষ কিছুতেই ভয় নেই!’

কম্যাণ্ডার শেষ বারের মতো ভিতিয়া কাকুকে লোফালুফি ক’রে ঠাকুমার কোলে তুলে দিলে। বলটা দিলে ঠাকুর্দাকে। আর বাবার দিকে চেয়ে বললে:

‘ছুটল হারুণ হরিণ বেগে...’

সবাই হেসে উঠল। তারপর ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সওয়ারীরা। ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, ছোট্ট বাবা আর খুব ছোট্ট ভিতিয়া কাকু বাড়ি ফিরে এল। ছোট্ট বাবাকে ঠাকুর্দা বললেন:

‘হারুণ হরিণ বেগে ছুটেছিল কারণ সে ছিল কাপুরুষ। লেরমন্তভের কবিতার লাইন এটা। ছি-ছি, লজ্জা হওয়া উচিত তোর!’

ভারি লজ্জা হল বাবার।

বড়ো হয়ে লেরমন্তভের সমস্ত কবিতাই বাবা পড়ে। কিন্তু এই কথাগুলো পড়বার সময় চিরকালই ভারি লজ্জা হত তার।

বাবা যখন ছোটো, তখন তার ভাব হয় একটি মেয়ের সঙ্গে। নাম তার মাশা। সেও তখন ছোটো। একসঙ্গে দিব্যি খেলত তারা। বালি দিয়ে ভারি সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানাত। কোথাও জল জমে থাকলে জাহাজ ছাড়ত। একসঙ্গে মাছও ধরত সেখানে। আর মাছ কখনো ধরা না পড়লেও ফুর্তি কখনো মাটি হত না।

এই মেয়েটির সঙ্গে খেলতে ভারি ভালো লাগত বাবার। কখনো বাবার সঙ্গে ঝগড়া করত না সে, ঢিল ছুঁড়ত না বাবার দিকে, ল্যাঙ মারত না। বাবার চেনা ছেলেরা সবাই যদি অমন হত,

তাহলে কী ভালোই না হত। কিন্তু ছেলেগুলো যেন একেবারেই অন্যরকম। মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে ব'লে সবাই ক্ষেপাত বাবাকে। ছড়া কাটত:

তুলতুল ময়দা
বরকনের সওদা!

জিজ্ঞেস করত:

'কবে বিয়ে হবে রে?'

মাঝে মাঝে বাবাকে তারা ইচ্ছে ক'রেই খুকি বলে ডাকত। বলত:

'কি রে খুকি এলি নাকি? গেছলি কোথায়?'

ভাবত, মেয়ের সঙ্গে ভাব করলে ব্যাটা ছেলের মান যাবে।

এতে ভারি রাগ হত বাবার। মাঝে মাঝে কেঁদেও ফেলত।

ছোট্ট খুকি মাশা কিন্তু কেবল হাসত। বলত:

'খেপাচ্ছে খেপাক। কান না দিলেই হল!'

তাই মাশাকে খেপিয়ে কোনো মজা হত না। কেবল ছোট্ট বাবাকেই খেপাত সবাই। মাশার দিকে নজরই করত না তারা।

একদিন এক মস্ত কুকুর ছুটে এল আঙিনায়। কে যেন চ্যাঁচালে:

'ওরে, পাগলা কুকুর!'

সবচেয়ে সাহসী ছেলেরাও যে যেদিকে পারলে ভোঁ ভাঁ। বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল আড়ষ্ট হয়ে। কাছেই কুকুরটা। মাশা মেয়েটি তখন বাবার কাছে দাঁড়িয়ে খেলনা কোদালটা ছুঁড়ে মারলে কুকুরটার দিকে। বললে:

'যা ভাগ, পালা বলছি!'

সবাই দেখলে পাগলা কুকুর ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। বুঝলে, কুকুরটা তাহলে পাগলা নয়। নেহাৎ এমনি পরের আঙিনায় এসে পড়েছে। আর কোনটা পরের ঘর, কোনটা নিজের সেটা কুকুরে ভালোই বোঝে। পরের ঘরে সবচেয়ে বদরাগী কুকুরও মেজাজ দেখায় কম।

ছেলেরা যখন দেখলে কুকুরটা ক্ষ্যাপা নয়, তখন সবাই ঢিল লাঠি নিয়ে তাড়া করল তাকে। তার জন্যে অবিশ্যি খুব একটা সাহসের দরকার করে না। কুকুরটাও তা জানত। তাই রাস্তা পর্যন্ত গিয়েই থেমে গেল কুকুরটা, গরগর ক'রে উঠল। ছেলেরা তখন নিজেদের আঙিনায় ফিরে এসে বাবার পেছনে লাগল। বললে:

'সবচেয়ে ভয় পেয়েছিলি তুই। ছুটে যে পালাবি সে সাধ্যিও ছিল না। দুয়ো!'

ছোট্ট বাবা কিন্তু ব'লে দিলে:

'হ্যাঁ, ভয় আমি পেয়েছিলাম তা মানছি, তোরাও পেয়েছিলি। ভয় পায় নি কেবল মাশা।'

ছেলেগুলোর মুখে তখন আর কথাটি নেই। লজ্জায় মরে সবাই। কিন্তু মাশা বললে:

'উহুঁ, আমারও ভয় হয়েছিল।'

শুনে হেসে উঠল সবাই। এর পর থেকে ছোট্ট বাবাকে কেউ আর কখনো খেপায় নি। মাশার সঙ্গে অনেকদিন ভাব ছিল বাবার।

শক্তি পরীক্ষা

বাবা যখন ছোটো, তখন তার সঙ্গী সাথী ছিল অনেক। রোজ সবাই খেলত একসঙ্গেই। ঝগড়া হত কখনো কখনো, মারামারিও বাদ যেত না। পরে আবার মিটে যেত। শুধু একটা ছেলে কখনো মারপিট করত না। নাম ছিল তার লিওনিয়া নাজারভ। দেখতে বেঁটে, কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ। বাপ ছিল তার বুদিওন্নির ঘোড়সওয়ার দলে। সেমিওন মিখাইলভিচ বুদিওন্নির গল্প করতে ভারি ভালোবাসত ছেলেটা। বলত কী রকম লড়াই করত সে শাদাদের সঙ্গে, কিছুতেই ভয় পেত না, জেনারেলই হোক কি কর্নেলই হোক, গুলিই হোক কি তলোয়ারই হোক — কিছুর পরোয়া করত না বুদিওন্নি। কেমন ছিল বুদিওন্নির ঘোড়া, কেমন তার কৃপাণ, সবই জানা ছিল লিওনিয়ার। বলত:

'বড়ো হয়ে ঠিক বুদিওন্নির মতো হব!'

ছোট্ট বাবা প্রায়ই যেত লিওনিয়ার কাছে। ভারি ফুর্তিতে কাটত সেখানে। ঘরে ওদের কাজ অনেক: রুটি কিনতে ছুটত লিওনিয়া, কাঠ ফাড়ত, মেঝেয় ঝাঁট দিত, বাসন ধুত। ছোট্ট বাবা বেশ দেখত যে বাড়ির সবাই খুব ভালোবাসে লিওনিয়াকে। লিওনিয়ার বাপ প্রায়ই এমন ভাবে লিওনিয়ার মত চাইত যেন লিওনিয়া এক বড়ো সড়ো মাতব্বর মানুষ:

'লিওনিয়া, তাহলে রোববারে কাকে নেমন্তন্ন করা যায়?'

'কাঠের অবস্থা কী রকম রে লিওনিয়া, বসন্ত পর্যন্ত টেনে বুনে চলবে?'

আর ঠিকঠাক জবাব দিতে লিওনিয়ারও দেরি হত না।

লিওনিয়াদের বাড়িতে কেউ গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে টেবলে বসিয়ে খাবার এগিয়ে দেওয়া হত। তারপর খেলা শুরু হত সবাই মিলে। ছোট্ট বাবার ভারি আফসোস হত যে তার নিজের বাড়িতে অমন ভালো ফুর্তি জমে না। লিওনিয়ার সঙ্গে তাই ভারি ভাব ছিল তার। তবে একটা জিনিস বাবা ভেবে পেত না: কেন কখনো মারামারি করে না লিওনিয়া। প্রায়ই তাকে বাবা জিজ্ঞেস করত:

'আচ্ছা তুই মারপিট করিস না কেন বলত? ভয় পাস?'

লিওনিয়া জবাব দিত:

'নিজেদের লোকেদের সঙ্গে মারামারি করে কী হবে?'

একবার ছেলেরা সবাই জুটে তর্ক করছিল কার গায়ে জোর বেশি। কেউ বলে:

'বড়ো ছেলেদেরও আমি ভয় পাই না। আর তোদের সবাইকে তো একেবারে বেড়াল-ছোঁড়া ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দেব। দেখেছিস কেমন মাস্‌ল্‌ — এই দ্যাখ!'

কেউ বলে:

'আমার গায়ে যা জোর না, নিজেই থ' মেরে যাই মাইরি। বিশেষ ক'রে আমার বাঁ হাতটা। একেবারে লোহার মতো।'

কেউ আবার বলে:

'এমনিতে আমার তেমন জোর নেই, তবে একবার যদি খেপে উঠি, তাহলে সাবধান! কী যে ক'রে বসব বলা যায় না।'

ছোট্ট বাবা বললে:

'তর্ক আবার কী। জোর আমার গায়েই বেশি, জানা কথা।'

সবাই বড়াই করছে। লিওনিয়া নাজারভ কিন্তু চুপ ক'রে শুধু শুনছে, কিছুই বলছে না। একটা ছেলে তখন বললে:

'বেশ কুস্তি হয়ে যাক। যে সবাইকে হারাতে পারবে, তার গায়েই জোর বেশি।'

রাজী হয়ে গেল সবাই। শুরু হয়ে গেল লড়াই। সবাই চাইছিল লিওনিয়া নাজারভের সঙ্গে লড়তে: ও তো কখনো মারামারি করত না, তাই সবাই ভাবত ছেলেটা দুবলা।

প্রথমে লড়তে চায় নি লিওনিয়া, কিন্তু যে ছেলেটির বাঁ হাতখানা লোহার মতো সে যখন লিওনিয়াকে জাপটে ধরলে, তখন রেগে উঠল লিওনিয়া, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে একেবারে চিৎ ক'রে ঠেসে ধরলে। তারপর বেড়াল-ছোঁড়া ক'রে সবাইকে ছুঁড়ে ফেলার হুমকি যে দিয়েছিল, তাকে ছুঁড়ে ফেললে লিওনিয়া। যে ছেলেটি ক্ষেপে উঠলে কী হয় বলা যায় না, তাকে কাবু করতে লিওনিয়ার এতটুকু দেরি হল না। ছেলেটা অবিশ্যি চিৎ হয়েও তখনো চিৎকার করছিল যে ঠিকমতো ক্ষেপে ওঠার ফুরসুত সে পায় নি, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে লিওনিয়া ধীরেসুস্থে ছোট্ট বাবাকে ধরাশায়ী করলে। বন্ধুত্বের খাতিরে ভাব করলে যেন বাবাকে চিৎ করাই সবচেয়ে কঠিন।

সবাই তখন বললে:

'সে কি রে লিওন্‌কা, তোর গায়েই দেখছি জোর বেশি! তাহলে চুপ ক'রে ছিলি যে?'

হেসে লিওনিয়া বললে:

'না তো কী, বড়াই করব?'

ছেলেরা কোনো জবাব দিলে না। কিন্তু গায়ের জোর নিয়ে বড়াই তারা আর করত না। বাবাও সেই থেকে বুঝলে: বড়াই করলেই জোর হয় না। লিওনিয়া নাজারভের সঙ্গে ভাব তার বেড়ে উঠেছিল আরো।

অনেক দিন কেটে গেছে। ছোট্ট বাবা বড়ো হয়েছে। অন্য শহরে উঠে যায় বাবা। লিওনিয়া এখন কোথায় বাবা তা জানে না। তবে সে যে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বাবা যখন ছোটো, তখন ভারি ভুগত সে। বাচ্চাদের যত রোগ হওয়া সম্ভব তার একটি বাদ দেয় নি বাবা। হামে ভুগেছে বাবা, হুপিংকাশিতে, মাম্পসে। প্রতিটি রোগের পর দেখা দিয়েছে আরো নানা উপসর্গ। আর সে সব কাটতেই শুরু হয়েছে নতুন আরেকটা রোগ।

যখন ইশকুলে ভর্তি হওয়ার সময় হল, তখনও বাবা রোগে শয্যাশায়ী। অসুখ সেরে যখন প্রথম পড়তে গেল, অন্য ছেলেদের ততদিনে অনেক জানা শোনা হয়ে গেছে। সবাই সবাইকে চেনে, স্কুলের দিদিমণিও সবাইকার নাম জানেন। ছোট্ট বাবাকে কিন্তু কেউই চেনে না। সবাই কেবল তাকিয়েই আছে তার দিকে। ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার সেটা। তাতে আবার কেউ কেউ জিভ বার ক'রে ভেংচিও কাটলে।

ল্যেঙ্গি মারলে একটা ছেলে। পড়ে গেল বাবা, কিন্তু কাঁদলে না। উঠে দাঁড়িয়ে বাবাও ধাক্কা দিলে ছেলেটাকে। সেও পড়ে গেল। তারপর উঠে সেও ধাক্কা দিলে বাবাকে। আবার পড়ে গেল বাবা, এবারেও কাঁদলে না। ধাক্কা দিলে ছেলেটাকে। এইভাবে বোধ হয় গোটা দিনটাই ধাক্কাধাক্কি চলত। কিন্তু ঘণ্টি বেজে উঠল। সবাই ক্লাসে ঢুকে ব'সে পড়লে নিজের নিজের জায়গায়। কিন্তু ছোট্ট বাবার নিজস্ব কোনো জায়গা ছিল না। তাকে বসানো হল একটা মেয়ের পাশে। তাতে ক্লাস সুদ্ধ সবাই হাসতে শুরু ক'রে দিলে। মেয়েটা পর্যন্ত হেসে উঠল।

তখন ভারি কান্না পেয়েছিল বাবার। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন মজা লাগল, বাবাও হাসতে শুরু ক'রে দিলে। দিদিমণিও তখন হাসতে হাসতে বললেন:

'সাবাস, এই তো চাই! আমি ভাবছিলাম বুঝি কেঁদে ফেলবি।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' বললে বাবা।

তাতে আবার হাসি শুরু হল আরেক দফা। দিদিমণি বললেন:

'শোনো সবাই, যখন কান্না পাবে, তখন কিন্তু হেসে ওঠার চেষ্টা করো। এই আমার উপদেশ, সারা জীবন মেনে চলবে! এবার এসো, পড়াশুনা করা যাক।'

ছোট্ট বাবা সেদিন শুনলে যে ক্লাসে সবার চেয়ে তার পড়াটাই ভালো। কিন্তু হাতের লেখাটা যে তার সবার চেয়েই খারাপ সেটাও সেই দিনই সে জানলে। আর যখন দেখা গেল পড়া চলার সময় সবচেয়ে বেশি গোলমালও বাবাই করে, তখন দিদিমণি আঙুল তুলে ধমকে দিতে ভুললেন না।

ভারি সুন্দর দিদিমণি ছিলেন ইনি। যেমন কড়া, তেমনি হাসি খুশি। ওঁর কাছে পড়তে ভারি ভালো লাগত সবার। আর তাঁর উপদেশটা বাবা সারা জীবন মনে ক'রে রাখে। ইশকুলে বাবার সেই তো প্রথম দিন। আর তেমন দিন আরো কতই না এসেছে পরে। ছোট্ট বাবার ইশকুল জীবনের ভালো মন্দ, হর্ষ বিষাদে ভরা আরো কত কাহিনী! কিন্তু সে তো আরো একটা বইয়ের ব্যাপার।

ইশকুলে
বাবা

বাবা যখন ছোটো, তখন সব ছেলেমেয়ের মতোই ইশকুলে যেত বাবা।

কিন্তু সবাই আসত পড়া শুরুর আগে। আর ছোট্ট বাবা আসত দেরি ক'রে। কখনো কখনো এসে পেঁছিতে দ্বিতীয় ঘণ্টাও বেজে যেত। ভয়ানক অবাক লাগত দিদিমণির। বলতেন, এমন ছেলে এ ইশকুলে তিনি আর দেখেন নি। হেড মাস্টার বলতেন, অমন ছাত্র অন্য ইশকুলেও সম্ভব নয়।

বলতেন, 'ঘড়িগুলোর মতোই এ ছেলেটার নির্ঘাৎ স্লো যাওয়াই অভ্যেস! ওর মা-বাপেরাও কিছু ক'রে উঠতে পারছে না। আমি দু'বার ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

সত্যিই ছোট্ট বাবার মা-বাবারা কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না। রোজ সন্ধ্যেয় সেই একই কাহিনী।

'ইশকুলের পড়া করলি?' জিজ্ঞেস করতেন ঠাকুমা।

'এই যে... এক্ষুণি...' বলত বাবা।

'গল্পের বই বন্ধ ক'রে পড়া করতে বস!' বলতেন ঠাকুর্দা।

'এই বসছি... শুধু এই পাতাটা শেষ ক'রে নিই,' বলত বাবা।

এবং সে পাতাটা শেষ ক'রে পরের পাতায় চলে যেত বাবা। অমন মন-কাড়া গল্প ফেলে নীরস ইশকুলের পড়ায় বসা একেবারেই অসম্ভব লাগত বাবার কাছে।

'বই রেখে দে বলছি!'

'এই যে... একটুখানি...'

'রেখে দে বলছি...'

'এই... একটু...'

শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দা ঠাকুমার ধৈর্য টুটত। ছোট্ট বাবার বই কেড়ে নিতেন তাঁরা। বলতেন:

'বড়ো হবি যে একেবারে কুড়ের বাদশা হয়ে!'

ভারি রাগ হয়ে যেত বাবার। অনেকখন ধ'রে কেঁদে কেঁদে বই ফেরত চাইত বাবা। বলত, বই না দিলে ইশকুলের পড়াও সে করবে না।

এই ক'রেই সন্ধ্যে কেটে যেত। শেষ পর্যন্ত যখন ইশকুলের পড়া নিয়ে সত্যি ক'রেই বসত বাবা, তখন চোখ জড়িয়ে আসত ঘুমে। ঘুম ভাঙিয়ে দিলে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। আবার জাগা, আবার ঘুম। পড়া যা হত তা কেমন খানিকটা আধো ঘুমের মধ্যে। এই ক'রেই গড়িয়ে আসত রাত। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দা ঠাকুমা হয়রান হয়ে নিজেরাই ঘুমিয়ে পড়তেন।

সকালে শুরু হত অন্য আরেক ইতিহাস।

'উঠলি!' বলতেন ঠাকুমা।

'এই যে...' বিড়বিড় করত ছোট্ট বাবা।

'কই, উঠলি!' হাঁক দিতেন ঠাকুর্দা।

'এই উঠছি...'

'ওঠ বলছি!'

'এই যে...'

'ইশকুলে দেরি হয়ে যাবে যে!'

'এই যে... উঠছি...'

'দেরি হয়ে গেছে কিন্তু...'

'এই যে...'

বেশি রাত ক'রে শুলে সকালে ওঠা যে কী কঠিন তা সবাই জানে। ঠিক ওই সময়টিতেই ভারি মিষ্টি হয়ে ওঠে ঘুম। বিশেষ ক'রে যদি আবার উঠেই স্কুলে যেতে হয়।

বাবা যতক্ষণে ধীরে সুস্থে উঠে, ধীরে সুস্থে পোষাক পরে, ধীরে সুস্থে মুখ হাত ধুয়ে, ধীরে সুস্থে চা খেয়ে, ধীরে সুস্থে খাতাপত্র গোছাত, ততক্ষণে অনেক সময়ই কেটে যেত। তারপরই পড়িমরি ছুটত ইশকুলে, রাস্তার সবকটি ঘড়ির দিকে চাইত আতঙ্কে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বাবাকে ক্লাসে ঢুকতে দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ত ছাত্ররা। দিদিমণিও হেসে উঠতেন:

'এই যে আমাদের লেট লতিফ এসে গেছে!' শুনে ভারি অপমান লাগত বৈকি।

ইশকুলের দেয়াল পত্রিকায় ছোট্ট বাবার ছবি বেরুত: বিছানায় শুয়ে প্রচণ্ড ঘুম দিচ্ছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তার মা-বাবা। দুই বালতি ঠাণ্ডা জল ঢালা হচ্ছে তার মাথায়। মস্ত একটা এলার্ম ঘড়ি ঝনঝনিয়ে বাজছে তার কানের কাছে। অন্য কানে শিঙা ফুঁকছে কোন একটা ছেলে। তলে লেখা আছে: 'খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ল...' খুবই অপমান লাগত বৈকি। কিন্তু ফের দেরি হয়ে যেত বাবার।

ইশকুলের পড়া যা করবার তা করত একেবারে শেষ মুহূর্তটিতে, ফলে সবই হত দায়সারা গোছের। ইশকুলে দেরি হওয়ায় দিদিমণি যে সব জিনিস বুঝিয়ে দিতেন তা শোনা হত না। এতে ব্যাঘাত হত পড়াশুনায়।

তাছাড়া দেরি হওয়ায় অনবরত তাড়াহুড়া, ছোটাছুটি, ছটফট করতে হত। তাতে স্বভাবের ওপর ফল ফলত খারাপ। তাহলেও দেরি করা তার গেল না।

আমার অবিশ্যি খুবই ইচ্ছে হচ্ছে বলি যে ছোট্ট বাবার মা-বাবারা শেষ পর্যন্ত কী একটা ফন্দি বার করলে, দেরি করার অভ্যেস তার কেটে গেল।

ইচ্ছে হচ্ছে বলি, ইশকুলের মাস্টাররা ছাত্ররা ছোট্ট বাবাকে নিয়ে এমন ঠাট্টা করতে লাগল যে বাবার ভারি রাগ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন সে ইশকুলে হাজির হল সব্বারই আগে, তারপর থেকে আর কখনো সে দেরি করে নি।

কিন্তু কী দরকার মিথ্যে কথা বানিয়ে।

সারা জীবনই সব জায়গাতেই দেরি হয়ে যেত বাবার। ইশকুলে আসত দেরি ক'রে। কলেজে ঢুকেও দেরি করা তার গেল না। যখন চাকরি করছে তখনো সেই দেরি। সবাই হাসত তাকে দেখে। শাস্তি পেতে হত। ভর্ৎসনা ধিক্কার কিছুই বাদ যায় নি। এই বদ অভ্যাসটির জন্যে জীবনে তার লোকসানও গেছে অনেক কিছু। কোথাও নেমন্তন্নে গেলে কখনোই সময়মতো যেতে পারত না বাবা। ফলে লোকে ভারি রাগ করত, কখনো কখনো বলেই দিত, অত দেরিই যদি হয় তাহলে

দয়া ক'রে নাই বা এলেন। কোনো একটা কাজে যাবার কথা, এতই দেরি হল যে কাজটি পণ্ড হল।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে নববর্ষ উৎসব পোঁছতে পোঁছতেই রাত বারোটা বেজে নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে পথের মধ্যেই। কত লোককেই না বাবা মুশকিলে ফেলেছে!

বাবার চেনা পরিচিতরা বাবাকে নিয়ে তাচ্ছিল্য ক'রে কত ঠাট্টার কাহিনীই বলে... কিন্তু আজো পর্যন্ত বাবা রাস্তায় কখনো ধীরে সুস্থে হাঁটতে পারে না। সর্বদাই তার তাড়া। কোথাও না কোথাও দেরি হয়ে যাওয়াই তার অভ্যেস। এমন কি রাতেও স্বপ্ন দেখে কোথায় যেন তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই চমকে গোঙিয়ে ওঠে। কখনো কখনো স্বপ্ন দেখে ফের যেন ছোটো হয়ে গেছে বাবা। ফের যেন ইশকুলে যাচ্ছে। ফুর্তি ক'রে ইশকুলের ঘড়ি দেখছে বাবা। আগেই এসে গেছে সে! স্বপ্ন দেখছে যেন দেরি হয় নি। সবাই তাকে বাহবা দিচ্ছে। হেড মাস্টার ফুল উপহার দিলেন তাকে। ইশকুলের হলঘরে টাঙানো হয়েছে তার ছবি। অর্কেস্ট্রায় ঝঙ্কার উঠছে। আর ঠিক এই সময়টিতেই চিরকাল ঘুম ভেঙে যায় তার। মনে হয় এবার থেকে আর কখনো তার দেরি হবে না। কিন্তু সে তো শুধু মনে হওয়া।

বাবা যখন ছোটো, তখন অনেকদিন পর্যন্ত সিনেমা দেখার সুযোগ হয় নি তার। সবাই বলত, 'এখনো তোর দেখবার মতো বয়স হয় নি… পরে দেখবি। মোটেই ভালো জিনিস নয়।'

এই কথা বলতেন ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা। পিসি আরো ফোড়ন দিতেন, 'সিনেমা হল এক ছোঁয়াচে রোগ। ঠিক একেবারে হাম রোগ, স্কার্লেট জ্বর, হুপিংকাশি… ডিপথিরিয়ার কথা নয় বাদই দিলাম…'

এবং ডিপথিরিয়া নিয়ে অনেক বৃত্তান্ত শোনাতেন পিসি। সিনেমায় যাবার জন্যে কত কাকুতি-মিনতি করত বাবা। বলত তার বন্ধুরা সবাই সিনেমায় যায়, কারো হাম, কি স্কার্লেট

জ্বর, কি হুপিংকাশি হয় নি, ডিপথিরিয়ার কথা নয় বাদই যাক। কিন্তু কোনো ফল হল না। সেই একই জবাব শুনতে হত:

'যখন ইশকুলে ভর্তি হবি তখন তো আর উপায় থাকবে না। তখন আর কে আটকাবে। তখন যাস যত খুশি।'

ছোটো বাবার সিনেমা দেখার সাধ মেটাতে হত চেনা ছেলেদের অভিনয় দেখে। ছেলেরা তাকে নকল ক'রে দেখিয়ে দিত কী ভাবে 'জেরোর চিহ্ন' নামে এক বিখ্যাত ছবিতে কী চমৎকার লাফ দিচ্ছে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, কী দারুণ তলোয়ার চালাচ্ছে, হঠাৎ কী ভাবে কালো মুখোস প'রে এসে হারিয়ে দিচ্ছে সমস্ত লোককে। ছড়ি হাতে চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় নকল করত তারা, নকল করত মজাদার ইগর ইলিনস্কি, রোগা ঢ্যাঙা পাত আর বেঁটে মোটা পাতাশনকে। অভিনয়গুলো তারা করত একেবারে মন প্রাণ ঢেলে, যা দেখানো সম্ভব সবই দেখাত। নামকরা কাউ-বয় উইলিয়ম হার্টকে নকল ক'রে জড়াজড়ি ক'রে লুটোত তারা।

বড়োদের কথাও কানে যেত বাবার। মেরি পিকফোর্ডের হাসি নিয়ে তারা মন্তব্য করত, 'অপূর্ব!'

'বল তো, কী রকম হাসি?' বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞেস করত ছোট্ট বাবা। 'বরফ গলার দিন' ছবিতে অভিনেত্রী মেরি পিকফোর্ড কী ভাবে হেসেছিল সেটা অভিনয় ক'রে দেখালে একটা ছেলে। খুব প্রাণ ঢেলেই সে দেখালে, সমস্ত ছেলেরাও একমত হয়েই বললে যে তার হাসিটা বলতে কি মেরি পিকফোর্ডের চেয়েও ভালো হয়েছে। তাছাড়া মেরি পিকফোর্ড তো কত বছর ধ'রে হাসছে, তার জন্যে আবার টাকাও পায়। আর এ ছেলেটা হাসল এই সবে দ্বিতীয় দিন, তাও বিনা পয়সায়, বন্ধুকে আনন্দ দেবার জন্যে।

ছোট্ট বাবা টের পেত যে সবাই তার জন্যে যথাসাধ্য সবই করছে। কিন্তু তাতে ক'রে সিনেমা দেখার ইচ্ছেটাই তার আরো বেড়ে উঠত।

তারপর সে শুভদিন সত্যিই এল। ইশকুলে ভর্তি হল বাবা। আর প্রথম রবিবারেই স্কুলের দিদিমণির সঙ্গে গোটা ক্লাস গেল ছেলেদের বিশেষ শো'য়ে সিনেমা দেখতে। ফিল্মটার নাম 'লাল দত্যি', ছোট্ট বাবা বইটা আগেই পড়েছিল। সেই বইয়ের কিশোর সব সন্ধানীবীর, মহা ভয়ঙ্কর মাখনো সর্দার, আর আশ্চর্য আশ্চর্য সব ঘটনাগুলো দেখবার জন্যে মুখিয়ে ছিল বাবা।

ছোট্ট বাবার বাড়ি থেকে সিনেমাটা বেশি দূরে নয়। বাবার ছোটো ভাই ভিতিয়া কাকু পর্যন্ত সিনেমাটা চিনত। তাই গুটিগুটি সিনেমায় সে এসে হাজির হয়ে যায় বাবার আগেই এবং ক্লাসের সমস্ত ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বসে। পটিয়ে নেয় দিদিমণিকে পর্যন্ত। হঠাৎ সেখানে ছোটো ভাইকে দেখে ছোট্ট বাবা কিছুই বললে না, শুধু তার কান ম'লে বাড়ি পাঠাতে চাইলে। ছোট্ট ভিতিয়া কাকু তাতে এমনি কান্না জুড়লে যে মুখ থেকে তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি

লজেন্স বেরিয়ে এল। বাবার ক্লাসের মেয়েরা সবাই ছেঁকে ধরে লজেন্স দিয়েছিল তাকে। ভিতিয়া কাকুও ভারি সুবোধ ছেলে। কেউ লজেন্স দিলে সে কখখনো আপত্তি করে না।

এমন আকুল কান্না শুরু করলে ভিতিয়া কাকু যে সারা ক্লাস তার পক্ষ নিলে। দিদিমণি পর্যন্ত বলে দিলেন, 'থাক, আসুক আমাদের সঙ্গে। আমি জিম্মা নিলাম।'

তা শুনে ছোটো ভাইয়ের কান ছেড়ে দিলে বাবা। সবাই ঢুকল সিনেমা হলে। ঘণ্টি বাজল। শিশুদের জন্যে শো, সিটের কোনো নম্বর ছিল না। চারিদিক থেকে দল বাঁধা এবং দল ছাড়া সব ছেলেই ছুটল হলের দিকে। সবার আগেই অবিশ্যি আহ্লাদে আটখানা হয়ে খরগোসের মতো লাফিয়ে গেল ছোট্ট ভিতিয়া কাকু। তাই হোঁচট খেয়ে পড়তে তার দেরি হল না। তার পেছু পেছু ছুটছিল ছোট্ট বাবা। ধাক্কা খেয়ে বাবা পড়ল কাকুর ওপর। আর গোটা ক্লাস দল বেঁধে ছুটল দুই ভাইয়ের পেছু পেছু এবং দল বেঁধেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। অতগুলোর ভার তো সহজ নয়। বিশেষ ক'রে যারা চাপা পড়েছে তলের দিকে। খরগোসের মতো লাফিয়ে এসেছিল ভিতিয়া কাকু, এবার কুকুরের কবলে পড়া খরগোসের মতোই কান্না জুড়লে সে। তা শুনে ছোটো বাবাও কাঁদতে শুরু করলে। এই সময় ছুটে এলেন দিদিমণি এবং অন্য দুই স্কুলের আরো দুজন মাস্টার। গোটা ভিড়কে থামালেন তাঁরা। টেনে তোলা হল বাবা আর ভিতিয়া কাকুকে। দুজনেরই গা হাত পা ছড়ে গেছে, কালসিটে পড়েছে। সুতরাং আহত হিসাবে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি পাঠানো হল তাদের। কালসিটে দেখে পিসি খুশি হয়ে মন্তব্য করলে, 'দেখলি তো, আগেই বলেছিলাম!'

এরপর ছোট্ট বাবার সিনেমা যাওয়া অনেক দিন বন্ধ ছিল। তবে কত দিন আর নিষেধ চলে। 'লাল দত্যি' ছবিটা বাবা দেখলে একদিন। দেখলে আরো অনেক ছবি। আজো পর্যন্ত সিনেমা দেখতে ভারি ভালোবাসে বাবা। ভিতিয়া কাকুও।

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে ভর্তি হয়েছে, তখন প্রায়ই এই রকম একটা দৃশ্য দেখা যেত। বিরতি শেষ হল। ঘণ্টি পড়ল। সবাই বারান্দা ছেড়ে নিজের নিজের জায়গায় এসে বসেছে। ছোট্ট বাবা শুধু একলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, ভ্যানভ্যান ক'রে কাঁদছে। বাবা কাঁদছে আর হাসছে সারা ক্লাস। দিদিমণি ক্লাসে এসে ব্যাপারটা দেখেই বুঝে নেন কী হয়েছে। হেসে বলেন:

'কী রে, ফের বুঝি মেয়েরা তোকে জ্বালিয়েছে।'

ছোট্ট বাবা কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নাড়ে।

ছোট্ট বাবাকে রাগাত কেন মেয়েরা? কী করত? খুবই সহজ ব্যাপার। ঘণ্টা পড়তেই ছেলেরা যখন ছুটে আসে, তখন মেয়েরা এসে বসে পড়ত ছোট্ট বাবার ডেস্ক দখল ক'রে। তিন কি চারটি মেয়ে ডেস্কটি জুড়ে বসে বাবার দিকে চেয়ে হাসত খিলখিলিয়ে। বাবা ওদিকে ভারি শান্ত লাজুক ছেলে। ইশকুলে ভর্তি হওয়ার আগে তার ভাব ছিল শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে — মাশা। মোটের ওপর মেয়েদের এড়িয়ে চলাই তার অভ্যেস। মেয়েরা সেটা টের পেয়েছিল। তাই পেছনে লাগত তার। এই হল ব্যাপার।

যদি পাশে শুধু একটি মেয়েই বসত, তাও নয় হত। কিন্তু তোমার জায়গাটি জুড়ে যখন বসেছে চার চারটি মেয়ে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে তোমায় দেখে, তখন সে যে একেবারেই অন্য ব্যাপার। তার ওপর যদি সারা ক্লাস সেই সঙ্গে হো হো ক'রে হাসে তাহলে আর পারা যায় না। ছোট্ট বাবা ক্লাস থেকে পালিয়ে গিয়ে দরজার কাছে কান্না জুড়ত। ক্লাসের ছেলেদের তো তাতে আরোই মজা লাগবে। কেউ কেউ উপদেশ দিত:

'বোকার মতো দেখছিস কী? ভাগিয়ে দে ওদের। লাগা এক ধাক্কা! এই মেয়েটাকে এ্যই এমনি ক'রে। তখন বুঝবে।'

আর যে মেয়েটি সবচেয়ে চেঁচিয়ে হাসত, সবার চেয়ে বেশি জ্বালাতন করত, তাকে ধাক্কা দিত তারা। মেয়েটি ভারি দুরন্ত, ভারি সুন্দর। নামটা বোধ হয় তামারা। নয়ত গালিয়া। মানে, ভেরাও হতে পারে, ল্যুসিয়াও হতে পারে। তবে খুব সম্ভবত ভালিয়া। মেয়েটিও নিশ্চয় ভালোই জানত যে ক্লাসের মধ্যে তাকেই ছোট্ট বাবার ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি। মেয়েরা সেটা চট ক'রেই বুঝে নেয়। সেইজন্যেই বোধ হয় অমন খিলখিলিয়ে হাসত সে। মেয়েটি হাসত, আর ছোট্ট বাবা ওদিকে কেঁদে আকুল।

শেষ পর্যন্ত দিদিমণির বিরক্তি ধ'রে গেল। একবার কাঁদুনে বাবাকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকে দিদিমণি বললেন:

'ক্লাসে ষোলো জন মেয়ে, আঠারো জন ছেলে। ষোলো জন মেয়েই কেবল একটি ছেলের পেছনেই লাগে। বাকি সতেরো জনের পেছনে কেন তারা লাগে না বলো তো? কে বলতে পারে?'

গোটা ক্লাস হেসে উঠল। দিদিমণি তখন ফের বললেন:

'কেবল একটা ছেলের পেছনেই কেন লাগে? মোটেই হাসির কথা নয়। উত্তর দাও।'

সবাই তখন চুপ ক'রে গেল। শুধু মেয়েদের মধ্যে চুপি চুপি খিলখিলানি থামে নি। একটি ছেলে হাত তুলে বললে:

'তার কারণ ও যে কাঁদতে শুরু ক'রে দেয়।'

‘ঠিক কথা!’ বললেন দিদিমণি, সবাই আবার হেসে উঠল, ‘আমি তো অনেক আগেই বলেছি কাঁদার চেয়ে হেসে দেওয়াই ভালো। মনে আছে তো?’ জিজ্ঞেস করলেন ছোট্ট বাবাকে।

কাঁদতে কাঁদতেই বাবা বললে:

‘মনে আছে।’

‘দেখিস, ভুলিস না কিন্তু,’ বললেন দিদিমণি, ‘নয়ত মেয়েগুলো তোকে সারা জীবন জ্বালাবে...’

সেটা বাবার মোটেই পছন্দ ছিল না। তাই পরের বার মেয়েরা যখন তার ডেস্ক জুড়ে ব’সে হাসতে শুরু করল, বাবা কাঁদলে না। সোজা গিয়ে সে বসলে ঠিক সেই মেয়েটির জায়গায়, যাকে তার ভালো লাগত। তখন সবাই হাসতে লাগল মেয়েটার দিকেই চেয়ে। মেয়েটি অবিশ্যি কাঁদলে না, তবে হাসিটা বন্ধ হল। সেই থেকে বাবাকে জ্বালাতন করা ছেড়ে দিলে মেয়েরা। সারা জীবন তাকে জ্বালাতন করেছে শুধু ছেলেরা। কিন্তু ছেলেরা তো সবাইকেই জ্বালায়। সেইজন্যেই তো ওরা ছেলে।

বাবার বাঘ শিকার

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে ঢুকেছে, তখন একবার বাঘ শিকার করে বাবা। বাঘটাও অবিশ্যি ছোটো। আর ইশকুলে না পড়লেও সে বাঘ থাকত ইশকুলেরই ময়দানে। ব্যাপারটা এই।

একবার বসন্তকালে ক্লাসের পড়ার পর ছোট্ট বাবা আর তার বন্ধুরা ইশকুলের ময়দানে ব'সে ব'সে রোদ পোয়াচ্ছে। ভারি মিষ্টি রোদ। দুনিয়ার সমস্ত ছেলেদের মতোই এক দমকায় রাজ্যের সমস্ত কথা নিয়েই আলাপ করছে ছেলেরা। আলাপ করছে ফুটবল নিয়ে, আগামী কালকের শ্রুতলিখন নিয়ে, গতকালের মারামারি নিয়ে, 'বাগদাদের চোর' সিনেমা নিয়ে, এবং কে কী

ধরনের আইসক্রীম ভালোবাসে, কে পাইওনিয়র শিবিরে যাবে, কে মা-বাপের সঙ্গে গাঁয়ের বাড়িতে একঘেয়ে দিন কাটাবে, সবকিছু নিয়েই। গল্প করছে সবাই, বাবা ওদিকে কী একটা বই পড়ছে। বইটার নাম কী তা আর মনে নেই। হয়ত মেইন রীড কিংবা এমার গুস্তাভ। হয়ত বা জুল ভার্ন। যাই হোক, সবাই চুপ করতেই ছোট্ট বাবা হঠাৎ বললে:

'ইস, বাঘ শিকার করতে পারলে কী মজাই না হত।'

শুনে সবাই হেসে উঠল, কিন্তু মিশা গর্বুনভ যাকে সবাই ডাকত গর্বুশ্‌কা ব'লে, চেঁচিয়ে উঠল:

'চলে আয় আমার সঙ্গে!'

সব ছেলেই তখন চেঁচাতে লাগল:

'চলে আয় আমার সঙ্গে, চলে আয়!'

কে একজন হাঁক দিলে:

'চল যাই গোটা ক্লাস!'

সবাই চ্যাঁচাল:

'চল যাই গোটা ক্লাস!'

'কিন্তু শিকার করা যায় কী ক'রে?' জিজ্ঞেস করলে মিশা গর্বুনভ।

'খুব সোজা,' বললে ছোট্ট বাবা, 'হাতির পিঠে চেপে যেতে হবে জঙ্গলে। সে কিন্তু গরম দেশের বন, ভয়ানক ঘিঞ্জি। বাঁদর থাকে সেখানে, কলাগাছ, ঝোলাগাছ...'

'ধুর তোর ঝোলাগাছ, শোল মাছ, সাত পাঁচ...' টিটকারি দিল গর্বুশ্‌কা, 'বাঘের কথা বল।'

'বাঘের কথাই তো বলছি। এই জঙ্গলেই বাঘ ওঁৎ পেতে থাকে। তারপর লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতির ওপর। অমনি গুলি করতে হয়। হাতিও অমনি শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারে। থেঁতলে দেয় পায়ের তলে। এই দ্যাখ না, সবই ছবিতে দেওয়া আছে।'

সব ছেলেই ছবিটা দেখলে অনেকক্ষণ ধ'রে। শেষকালে গর্বুশ্‌কা বললে:

'তাহলে বাস্‌! তুই, তুই, তুই, তুই আর তুই হবি হাতি। আমি, ও, ও, ও আর ও হব শিকারী। এই ময়দানটা হল জঙ্গল। বন্দুকের বদলে সব শিকারী নেবে একটা ক'রে লাঠি। নিয়েছ সবাই? এবার হাতির পিঠে চেপে চললাম। চুপ্‌! ওই দ্যাখ বাঘ। দেখেছিস কেমন ডোরা-কাটা!'

'ওটা তো বেড়াল,' বললে ছোট্ট বাবা।

'চুপ ক'রে থাক! কিছুই তুই বুঝিস না! হুকুম দেব আমি! হাতিরা সব এগোও!'

ছোটো বাবা ছিল শিকারী। নিজের হাতির ওপর চেপে বাবা দেখলে ডোরা-কাটাটা অবাক হয়ে চেয়ে আছে হাতি আর শিকারীদের দিকে, এতই হতভম্বের ব্যাপার যে ছুটেও পালাল না। এই সময় হুকুম দিলে গর্বুশ্কা:

'লাগাও গুলি!'

লাঠি ও ঢিলের বৃষ্টি ছুটল বেড়ালের দিকে। ছোট্ট বাবাও স্থির থাকতে পারল না, লাঠি ছুঁড়ল, কিন্তু লাগল না। ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গেল বেড়ালটা। সেই সময় কার একটা ঢিল লাগল তার মাথায়। মিউমিউ ক'রে পড়ে গেল বেড়ালটা। বার দুই খিঁচুনি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'মারা পড়েছে বাঘ!' চিৎকার করল গর্বুশ্কা।

কিন্তু ছেলেদের মধ্যে কে যেন বলে উঠল:

'যাঃ মরে গেল যে বেড়ালটা...'

সবাই ছুটল বেড়ালটাকে দেখতে।

ছোট্ট শান্ত ডোরা-কাটা বেড়ালটা প'ড়ে আছে। প'ড়ে আছে, নড়ছে না। হঠাৎ ছোট্ট বাবার মনে হল, বেড়ালটা ছিল জীবন্ত। কিন্তু এখন সেটা মরা। আর কখনো সে লাফালাফি ছোটাছুটি করবে না, খেলবে না অন্য বেড়ালছানার সঙ্গে। কখনো আর সে বড়ো হুলো হয়ে উঠবে না। ইঁদুর ধরবে না আর, মিউমিউ করবে না চালের ওপর। কিছুই আর করবে না। বাঘ-বাঘ খেলার কোনো ইচ্ছেই হয়ত এ বেড়ালের ছিল না। কেউ তো তার মত নেয় নি। চুপ ক'রে বেড়ালছানার কাছে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেরা। চুপ ক'রে রইল গর্বুশ্কাও।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল:

'আমার বেড়াল! আমার বেড়াল...' কাঁদলে মাথায় মস্ত নীল ফিতে বাঁধা ছোট্ট মেয়েটি।

বেড়ালটিকে কোলে তুলে বাড়ি চলে গেল সে। ছেলেরাও চলে গেল যে যার দিকে, কেউ কারো দিকে চাইতে পারল না।

সেই থেকে বাবা কখনো বেড়াল, কুকুর কি অন্য কোনো জন্তুর পেছনে লাগে নি। এখনো পর্যন্ত বেড়ালটার জন্যে ভারি কষ্ট হয় তার।

বাবা যখন ছোটো, তখন ভারি ভালোবাসত ছবি আঁকতে। একবার রঙীন পেনসিল উপহার পেল বাবা। তারপর থেকে সারা দিন ধ'রে কেবল ছবিই আঁকত। আঁকত কেবল বাড়ি, প্রত্যেকটা বাড়ির ওপর চিমনি। প্রতিটি চিমনি থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছে। প্রতিটি বাড়ির কাছেই গাছ আর প্রতিটি গাছেই পাখি। বাড়ির রং লাল, চালার রঙ হলদে, চিমনির রঙ কালো আর ধোঁয়ার রঙ নীলে গোলাপিতে মেশা। গাছগুলো হত নীল আর পাখিগুলো সবুজ। বেগুনী রঙের আকাশে জ্বলত সোনা রঙের সূর্য, তার পাশেই ভেসে আছে রুপোলী রঙের চাঁদ,

চারিপাশে সোনালী রুপোলী তারা। ভারি সুন্দর হত ছবিখানা, কিন্তু তা দেখে সবাই কেবল একটা কথাই জিজ্ঞেস করত:

'এমন নীল গাছ আর সবুজ পাখি তুই দেখলি কোথায়?'

বাবাও একই উত্তর দিত:

'কেন, এই ছবিতেই।'

ইশকুলে ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত বাবার ধারণা ছিল ছবি আঁকার হাত তার ভালোই। কিন্তু ইশকুলে ড্রয়িং ক্লাসে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করলে। আঁকা তার এতই খারাপ হত যে ড্রয়িং মাস্টার তাকে কিছুই বলতেন না। অথচ অন্য ছেলেদের বলতেন 'দিব্যি হয়েছে' নয়ত 'ভালো হয় নি' কিংবা 'এই জায়গাটা ঠিক ক'রে আঁক'।

এমন কি 'ভালো হয় নি' এ কথাটাও কখনো তিনি বাবাকে বলেন নি। ছোট্ট বাবার ছবি দেখে ড্রয়িং মাস্টার চুপ ক'রে নিজের মাথা চেপে ধরতেন। মুখের ভাবটা হত এমন যেন মস্ত এক টোকো লেবু খাচ্ছেন বিনা চিনিতে। ছাল সুদ্ধ অমনি একটা লেবু খেয়ে আয়নায় তাকিয়ে দেখো, ড্রয়িং মাস্টারের মুখের ভাব হত ঠিক অমনি।

মেয়েদের মধ্যে কারো কারো আবার কষ্ট হত বাবার জন্যে। ড্রয়িং মাস্টার অন্য দিকে মুখ ফেরালেই বাবার খাতায় চটপট ড্রয়িং এ'কে দিত তারা। যতটা পারা যায় খারাপ ক'রে আঁকারই চেষ্টা করত মেয়েরা, কিন্তু বাবার মতো অত খারাপ কারুরই হত না। ড্রয়িং মাস্টারও সঙ্গে সঙ্গেই পরের আঁকা ধ'রে ফেলতেন। ছোট্ট বাবাকে বলতেন:

'কে এ'কেছে এটা?'

ছোট্ট বাবাও সাধুর মতোই কবুল করত:

'আমি নই...'

'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলতেন মাস্টার, 'কিন্তু কে করেছে সেইটে জানতে চাইছি। অমন করলে যে তুই শিখতে পারবি না কখনোই। আঁকতে হয় নিজে নিজেই।'

'এখুনি এ'কে দিচ্ছি নিজেই,' বলত বাবা। এবং এ'কে দেখাত। ড্রয়িং মাস্টারও নিজের মাথাটি চেপে ধ'রে বলতেন:

'হ্যাঁ, এবার বেশ দেখতে পাচ্ছি তোরই আঁকা।'

মাঝে মাঝে অভিভাবক সভা বসত। তাতে বক্তৃতা দিতেন ড্রয়িং মাস্টার:

'কমরেড অভিভাবকেরা, আমার ক্লাসে ড্রয়িঙে চমৎকার এগুচ্ছে পাঁচটি ছেলেমেয়ে।'

তাদের উপাধিগুলো জানাতেন।

'অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মোটের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছু ছেলেমেয়ে খানিকটা কাঁচা।'

এই ব'লে আরো তিনজনের নাম করতেন মাস্টার। তারপর বলতেন:

'আরো একটি ছেলে আছে...' এই ব'লে নিজের মাথা চেপে ধ'রে মুখ ব্যাজার ক'রে ছোট্ট বাবার নাম করতেন, 'ছেলেটি শুধু কাঁচাই নয়। আমার ধারণা কোনো একটা রোগ আছে তার, ফলে কিছুতেই আঁকতে পারে না।' ব'লে আবার মাথা চেপে ধরতেন তিনি।

নিজেদের ছেলেটির এমন গুণের কথা শুনে ঠাকুর্দা ঠাকুমার ভারি খারাপ লেগেছিল বৈকি। কিন্তু কথাটা সত্যিই। ইশকুল শেষ হল বাবার। পরে টেকনিকাল স্কুল। তারপর কলেজ। এই এতদিন ধ'রে বাবা আঁকতে শিখল কেবল বেড়াল। আর বেড়াল তো সবাই আঁকতে পারে। এমন কি ইশকুলে ঢোকার বয়স হয় নি যাদের তারাও বেড়াল আঁকতে পারে। আর সে আঁকা দেখে রীতিমতো হিংসেই হত বাবার। কেননা ওদের আঁকা বেড়াল হত বাবার চেয়ে অনেক ভালো। অবিশ্যি একবার এমন একজন শিল্পীকে দেখেছিল বাবা যে ছবি আঁকত তার মতোই খারাপ। কিন্তু বলত, 'এই মুখটা, এই গাছটা, এই ঘোড়াটা... এগুলোকে ঠিক এইভাবেই যে আমি দেখি...'

কী আশ্চর্য, এমন একটা কৈফিয়ৎ যে আছে সেটা কখনো মনেই হয় নি বাবার। কী আফসোস যে ড্রয়িং মাস্টারকে সে কখনো এমনি একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারে নি। দুই হাতেই তাহলে কী ভাবেই না নিজের মাথাটা চেপে ধরতেন মাস্টার মশাই।

মিথ্যে কথা

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন ক্লাসের দিদিমণিকে ভারি ভালোবাসত বাবা। সব ছেলেমেয়েই ভালোবাসত তাঁকে। মাথায় বেশ লম্বা ছিলেন তিনি, দেখতে তেমন সুন্দর নন, পরতেন সর্বদাই কালচে গাঢ় রঙের পোষাক। দেখতে সুন্দর নন সেটা অবিশ্যি বলত বড়োরা। ছোট বাবার কাছে কিন্তু সুন্দরী বলেই মনে হত তাঁকে। সবাই তাঁকে ডাকত আফানাসিয়া নিকিফরভনা। যেমন হাসিখুশি, তেমনি কড়া। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা: ভারি ন্যায় বিচার করতেন। সব ছেলেমেয়েই জানত: আফানাসিয়া নিকিফরভনা যদি কারো ওপর রাগ করেন, তাহলে নিশ্চয় তার কোনো দোষ আছে। ছেলেমেয়েদের ওপর কখনো খামোকা রাগ করেন নি তিনি। কোনো রকম এক চোখোমিও তাঁর কিছু ছিল না। সব ছাত্রকেই সমান ভালোবাসতেন তিনি। আর দুষ্টুমি করলে কি পড়া না করলে সে যেই হোক রেগে উঠতেন।

সব ছেলেমেয়েই জানত যে আফানাসিয়া নিকিফরভনা এ ইশকুলে কাজ করছেন আজ কুড়ি বছর। এও সবাই জানত যে যারা হামবড়াই কি কেপটামি করে, চুপি চুপি অন্যের নামে লাগায় তাদের তিনি পছন্দ করেন না।

পড়াতেন ভারি চমৎকার ক'রে। তাঁর ক্লাসে তাই সবাই শুনত চুপ ক'রে মন দিয়ে। একবার ক্লাসে কে যেন পিন ফুটিয়ে দেয় বাবার পিঠে। বেশ লেগেছিল বৈকি। বাবাও চেঁচিয়ে উঠল:

'উঃ!'

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন:

'কী ব্যাপার? পড়ায় ব্যাঘাত করছ যে?'

ছোট্ট বাবা চুপ ক'রে রইল।

দিদিমণি বললেন:

'বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে।'

বাবা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগুল। এই সময় চেঁচিয়ে উঠল দুটি মেয়ে:

'জাইচিকভ ওর পিঠে পিন ফুটাচ্ছিল!'

আফানাসিয়া নিকিফরভনা তখন বললেন:

'বেশ, যে চিৎকার করেছে, যে পিন ফুটিয়েছে আর যারা পরের নামে নালিশ করতে গেছে, সবাই বেরিয়ে যাক। ঠিক কথা?'

সবাই চ্যাঁচাল:

'ঠিক কথা!'

ছোট্ট বাবা আর জাইচিকভের সঙ্গে মেয়ে দুটিও বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে। বাবা যাচ্ছে আর কাঁদছে। ভারি অভিমান হচ্ছিল তার। পিনের খোঁচাটাও সেই খেলে, আবার ক্লাস থেকেও তাকেই বেরিয়ে যেতে হল। জাইচিকভ কিন্তু যায় আর বাবাকে আর মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল মুখে যতই করুক, ফুর্তি ঠিক বেরচ্ছে না। মেয়ে দুটি হাসলেও না, কাঁদলেও না, তবে তাদেরও অভিমান হচ্ছিল বৈকি!

পরের দিন ছোট্ট বাবা ইশকুলে এল এক মস্ত পেরেক নিয়ে। আফানাসিয়া নিকিফরভনা যখন ছাত্রদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বোর্ডে কী একটা লিখছেন, সেই ফাঁকে ছোট্ট বাবা তার পেরেকটি দিয়ে খোঁচা মারলে জাইচিকভের হাতে। জাইচিকভ এমন জোরে ককিয়ে উঠল যে আফানাসিয়া নিকিফরভনা ভারি রেগে গেলেন। বললেন:

'জাইচিকভ, আবার তুমি?'

'আ-আ-আমি নই... আ-আ-আমাকেই...' খোঁচার জায়গাটা চেপে ধরে কোঁকালে জাইচিকভ।

'বটে, কাল খোঁচা দিলে, আজ খোঁচা খেলে, তাই না। কে খুঁচিয়েছে ওকে?'

সবাই তাকাল ছোট্ট বাবার দিকে। কিন্তু চুপ ক'রে রইল সবাই। পরের নামে লাগাতে চাইছিল না কেউ। জাইচিকভ পর্যন্ত শুধু ফোঁপালে কিছু বললে না।

'কে করেছে?' ভয়ানক রাগ ক'রে জিজ্ঞেস করলেন আফানাসিয়া নিকিফরভনা।

ছোট্ট বাবা এমন ভড়কে গেল যে হঠাৎ বলে বসল:

'আমি ওকে খোঁচাই নি...'

আফানাসিয়া নিকিফরভনা জিজ্ঞেস করলেন:

'কী দিয়ে খোঁচাও নি?'

চটপট জবাব দিলে বাবা:

'এই পেরেকটা দিয়ে।'

সবাই এমন জোরে হেসে উঠল যে পাশের ক্লাসের মাস্টার মশাই পর্যন্ত ছুটে এলেন। বললেন:

'কী ব্যাপার আফানাসিয়া নিকিফরভনা, এত আনন্দ যে?'

আফানাসিয়া নিকিফরভনা বললেন:

'আনন্দের কারণ এই পেরেকটা দিয়ে একটা ছেলে কাউকে খোঁচা দেয় নি, কেউ চ্যাঁচায় নি আর ক্লাসের কেউই কারো নামে লাগায় নি। আর কেউই পুরনো দিদিমণির কাছে কোনো মিছে কথা বলে নি।'

সব ছেলেরই তখন ভারি লজ্জা হল। সবাই রক্ত চক্ষুতে চাইলে বাবার দিকে। বাবা তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললে:

'কাল আমায় খোঁচা দিয়েছিল, আমি চেঁচিয়েছিলাম। আজ আমি ওকে খোঁচা দিই, ও চ্যাঁচায়। মিছে কথা বলেছিলাম আমি।'

এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বাবা বললে:

'আর করব না আফানাসিয়া নিকিফরভনা।'

'আমিও আর করব না,' বললে জাইচিকভ, কিন্তু সেই সঙ্গে কিল তুলে হুমকি দিলে বাবাকে। কেউ অবিশ্যি তার কথা বিশ্বাস করলে না।

আফানাসিয়া নিকিফরভনা বললেন:

'মিথ্যে কথা বলার মতো খারাপ আর কিছু হয় না।'

ছোট্ট বাবা তারপর থেকে আর কখনো মিছে কথা বলে নি। মানে, প্রায় কখনো না।

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন তার ভাব হয় একটি ছেলের সঙ্গে। নাম তার মিশা গর্বুনভ, কিন্তু ক্লাসে মাস্টাররা ছাড়া কেউ তাকে ও নামে ডাকত না। সবাই বলত গর্বুশ্‌কা।

ভারি দুরন্ত ছিল ছেলেটা। একটা ক'রে ক্লাস শেষ হতেই চারপাশে তার মস্ত ভিড় জমে যেত। বেড়াল ডাকা, কুকুর ডাকা, মৌমাছির বনবন, শুয়োরের ঘোঁৎঘোঁৎ সবই নকল করতে পারত সে। সবচেয়ে তার ভালো উৎরাত মোরগ-ডাক। সে এক পুরো যাত্রা। প্রথমে দেখাত কী

ভাবে বাচ্চা মোরগ ডাকতে চায় কিন্তু ডাক বেরয় না। বেরয় শুধু কোঁ-কোঁ, কিন্তু কোঁকর কোঁ-টা আর হয় না। তারপর বেড়ার ওপর উড়ে বসল মোরগটা, জীবনে প্রথম কোঁকর কোঁ ডেকে উঠে ডানা ঝটপট করছে গরব ক'রে। গর্বুশ্‌কা এই সময়টা তার সার্ট তুলে চাপড় মারে ন্যাংটা পেটের ওপর। শব্দটা হয় ঠিক ডানা নাড়ার মতোই। তবে টিফিনের ছুটিটা যত বড়োই হোক, গর্বুশ্‌কার সমস্ত প্রতিভা কি আর তাতে কুলোয়। তাই ক্লাসের পড়ার সময়েও মাঝে মাঝে মিউমিউ ক'রে ওঠে বেড়াল, ঘোঁৎঘোঁৎ ক'রে ওঠে শুয়োরছানা।

দিদিমণি বলতেন:

'মিশা গর্বুনভ, ঘোঁৎঘোঁৎ মিউমিউ বন্ধ করলি? কোঁকোর কোঁ করবি না বলছি! কী, কানে যাচ্ছে না? কুকুর ডাকা থামা! ব্যাঙ ডাকাটা আর কত চলবে? ফের কিচিরমিচির শুরু করেছিস? সাবধান বলছি, মাছি ডাকতে শুরু করলেই ক্লাস থেকে বার ক'রে দেব।'

তবে ক্লাস থেকে মিশাকে বার ক'রে দেওয়া হত কদাচিৎ। দিদিমণি ভালোবাসতেন গর্বুশ্‌কাকে, প্রায়ই নিজেই হেসে উঠতেন তার এই সব বিদ্যায়। এমন কি হেড মাস্টারও সবার সামনেই না হেসে ফেলে পারেন নি। মিশাকে একবার নিজের দপ্তরে ডেকে পাঠান তিনি, তার দুষ্টুমির জন্যে অনেকক্ষণ ধ'রে বকাবকি করেন। তারপর ব'লে দেন:

'যা পালা, আর যেন তোকে এখানে না আসতে হয়!'

মিশাও অমনি মাটিতে হাত দিয়ে 'পি-কক' হয়ে দাঁড়ায় এবং হাতে হেঁটেই বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এরপরে অবিশ্যি খোদ মিশার অভিভাবকদেরই ডেকে পাঠান হেড মাস্টার, তবে হেড মাস্টার নিজেই যে কী হাসি হেসেছিলেন সেটা সবাই দেখেছে।

একদিন এই মিশাই ক্লাসের পর বললে:

'দেখবি, ট্রাম গাড়ি থামিয়ে দেব?'

বলাই বাহুল্য সবাই চেঁচিয়ে উঠল:

'ঠিক আছে, দেখা!'

'চল তাহলে!' বললে গর্বুশ্‌কা।

সবাই তার পেছু পেছু গেল রাস্তায়। ইশকুলের খুব কাছেই ট্রামলাইন।

গর্বুশ্‌কা বললে:

'এখানে দাঁড়া তোরা, এখান থেকে দেখবি।'

দূরে ট্রাম দেখা যেতেই গর্বুশ্‌কা লাইনের ওপর শুয়ে প'ড়ে দুই হাতে মাথা ঢাকলে। গাড়িটা আসছিল বেশ জোরেই। লাইনের ওপর লোক দেখে প্রচণ্ড ঘণ্টি দিতে লাগল ড্রাইভার। গর্বুশ্‌কার কিন্তু নড়ন চড়ন নেই। প্রচণ্ড শব্দে কাছিয়ে আসছে গাড়ি। ছেলেরা একেবারে আড়ষ্ট। হঠাৎ একেবারে কাছে এসে থেমে গেল ট্রাম। ঘণ্টির শব্দ বন্ধ হতেই গর্বুশ্‌কা লাফিয়ে

উঠে ছুটে পালাল গলির মধ্যে। ড্রাইভার শুধু ঘুষি তুলে হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হল। চলে গেল গাড়ি, সব ছেলেও অমনি ছেঁকে ধরলে গর্বুশ্‌কাকে।

জিজ্ঞেস করলে:

'কী রকম লাগছিল রে? ভয় করছিল না?'

'ভয়ের কী আছে?' বললে গর্বুশ্‌কা।

'যদি ব্রেক না কষত?'

'তাহলে ড্রাইভারকেই থানায় যেতে হবে।'

'আর যদি তোকে ধরে ফেলত।'

'গাড়ি ফেলে রেখে যাবে কোথায়। আইন নেই।'

বোঝা গেল সবই ভেবে চিন্তে খতিয়ে দেখেছে গর্বুশ্‌কা।

পরের দিন ট্রাম গাড়ি থামালে কলিয়া স্তেপানভ। তারপর কস্তিয়া ফেদোতভ। তারপর সিকোর্স্কিরা দুই ভাই। তারপর কে যেন মেয়েদেরও নেমন্তন্ন করলে দেখতে। আর সেই হল বাবার কাল। দেখা গেল বাবা ছাড়া সব ছেলেই একবার না একবার ট্রাম থামিয়েছে। কথাটা মেয়েদেরও জানা, তাই না করা আর চলে না। ইশকুলের সবাই যখন শুনলে যে সেদিন ছোট্ট বাবা গিয়ে শুয়েছে লাইনের ওপর তখন অন্য ক্লাস থেকেও ছুটে এল মেয়েরা। ছোট্ট বাবা তো ভারি শান্ত শিষ্ট ছিল কিনা। কেমন ক'রে সে ট্রাম থামায় সেটা দেখতে লোভ হল সবারই।

এমন ভিড় জমে গেল যে দূর থেকেই ড্রাইভারের চোখে পড়ল সেটা। ছোট্ট বাবা এদিকে চোখ বন্ধ ক'রে কানে আঙুল দিয়ে শুয়ে আছে লাইনে। ড্রাইভার ওদিকে চুপি চুপি গাড়ি থামিয়ে ছুটল বাবার দিকে।

ছোট্ট বাবার মনে হল যেন ট্রামটা বুঝি না থেমেই এসে পড়েছে তার ওপরেই। আসলে এসে পড়েছিল শুধু ড্রাইভার। বাবার কলার চেপে ধ'রে চিৎকার করলে:

'এবার বাছাধনকে ধরেছি!'

ভয়ে ছুটে পালাল সবাই। শুধু মিশা গর্বুনভ গলির মধ্যে থেকে চ্যাঁচাল:

'আইন নেই কিন্তু, আইন নেই!'

কিন্তু কেই বা তার কথা শোনে।

ছোট্ট বাবাকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। সেখানে তার ঠিকানা টুকে রাখা হল। তারপর ঠাকুর্দা ঠাকুমা আর ইশকুলের হেড মাস্টারের ডাক পড়ল থানায়। তারপর বাড়িতে শাস্তি পেতে হল ছোট্ট বাবাকে, ইশকুলে লাঞ্ছনা। ইশকুলের দেয়াল পত্রিকায় লেখা বেরুল তার নামে। ঠাকুর্দা ঠাকুমা, হেড মাস্টার, সবাই ভেবেছিল একা ছোট্ট বাবাই বুঝি এতদিন ধ'রে ট্রাম থামিয়েছে।

ছোট্ট বাবার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে যে গর্ব্র্শ্কা, কলিয়া স্তেপানভ, কস্তিয়া ফেদোতভ, সিকোর্স্কি ভাইয়েরা — ট্রাম থামিয়েছে সবাই। ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু বললে না।

এরপর অনেকদিন ধ'রে এই ঘটনাটা নিয়ে বাবাকে টিটকারি দিত সবাই। সব ছেলে সব মেয়েই হাসাহাসি করত। কেননা ধরা পড়েছিল তো কেবল বাবাই। গর্ব্র্শ্কা পর্যন্ত বললে :

'পারিস না যখন, যাস্ কেন?'

কিন্তু তারপর থেকে আর কেউ কখনো শোয়ার চেষ্টা করে নি লাইনের ওপর। ড্রাইভারের হাতে ধরা পড়াটা এখন সৌভাগ্য বলেই বাবা মানে। তার ফলে অন্তত ট্রাম গাড়ি চাপা পড়ার বিপদ ঘটে নি কারো। সেটা তো আর কম কথা নয়।

সাপ মারা

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন হঠাৎ একবার সাপ মারে বাবা। ঘটনাটা এই। ক্লাসের পর দিদিমণি একদিন বললেন:

'কাল আমরা সব বেড়াতে যাব বনে। দেখছ তো, কেমন বসন্ত এসে গেছে! বনে বনে বেড়ানো যাবে, কচি ঘাস দেখব, রোদ পোয়াব। কে কে রাজী?'

হাত তুললে সবাই। ছোট্ট বাবাও।

দিদিমণি তখন হেসে বললেন:

'আর কে গররাজী?'

সবাই ফের হাত তুললে। ছোট্ট বাবাও।

'সে আবার কী!' জিজ্ঞেস করলেন দিদিমণি। ভারি অবাক লেগেছিল তাঁর, 'বনে বেড়াতে চাও, নাকি চাও না?'

'চাই! চাই!' চ্যাঁচাল সবাই।

'তাহলে গররাজীর বেলায় হাত তুলে ভোট দিলে যে সবাই?'

সেটা যে কেন সেটা কেউ ঠিক বোঝাতে পারলে না। শুধু আস্তে ক'রে একটি মেয়ে বললে:

'ভোট দিতে আমরা ভালোবাসি...'

সবাই হেসে উঠল। দিদিমণিও হাসলেন। বললেন:

'হাঁদারাম সবাই। যাক, সঙ্গে জলখাবার নিতে ভুলো না। বনে তো আর খাবারের দোকান নেই। এবার বাড়ি যাও।'

সবাই তখন উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ ছোট্ট বাবা ফের হাত তুললে।

অবাক হয়ে দিদিমণি বললেন:

'সে কী রে? তুই-ও বুঝি ভোট দিতে ভালোবাসিস?'

হেসে উঠল সবাই। ছোট্ট বাবাও। তারপর বললে:

'কোদাল নিয়ে যাওয়া চলবে?'

আবার হেসে উঠল সবাই। দিদিমণি বললেন:

'তা তোমরা যখন ভোট দিতে ভালোই বাসো, তখন এটার ওপরেও ভোট নেওয়া যাক। কে কে কোদালের পক্ষে?'

সবাই হাত তুলল।

'সর্ববাদীসম্মত!' রায় দিলেন দিদিমণি।

তাই কোদাল নিয়েই বনে গেল বাবা। তখনো তো ভারি ছোটো কিনা। আর নিজের কোদালটিকে ভারি ভালোবাসত বাবা। সবাই তার পক্ষে ভোট দিয়েছে বলে বাবার আনন্দের আর সীমা ছিল না।

ভারি ভালো বনটা। শীতের পর গাছে গাছে সবুজ পাতা ফুটেছে। কচি ঘাসগুলো দেখতে এতই সুন্দর যে ভারি অবাক লাগল ছোট্ট বাবার।

দিদিমণি বললেন:

'এই ছেলেরা এই মেয়েরা, দ্যাখো তো গাছটার দিকে। কে বলতে পারে কী গাছ ওটা?'

'ওক গাছ! ওক গাছ!' চ্যাঁচাল সবাই।

আর যে মেয়েটি ভোট দিতে ভালোবাসত (নাম তার ওলিয়া), সে আস্তে ক'রে বললে:

'মহাকায় বুড়ো ওক...'

কেন যে বললে সেটা কেউ বুঝে পেল না। দিদিমণি পর্যন্ত অবাক হয়ে চাইলেন। তারপর ফের জিজ্ঞেস করলেন:

'আর এটা কী গাছ?'

ফের সবাই চ্যাঁচাল:

'বার্চ গাছ! বার্চ গাছ!'

ছোট্ট বাবার চোখে পড়ল, আবার মুখ খুলছে ওলিয়া। দেখেই আস্তে ক'রে ফোড়ন কাটলে বাবা:

'মহাকায় কচি বার্চ!'

তাতে রাগ হয়ে গেল মেয়েটার, জিভ দেখিয়ে ভেঙচি কাটলে। বাবা তাতে এবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বললে:

'মহাকায় কচি জিভ!'

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু দিদিমণি বললেন:

'যারা গোলমাল করবে তাদের বন থেকে বার ক'রে দেওয়া হবে!'

এমন কড়া ক'রে বললেন যে ভয়ে সবাই চুপ মেরে গেল। তা দেখে নিজেই হেসে ফেললেন দিদিমণি।

তারপর বলতে লাগলেন কী কী গাছ হয় আমাদের রুশী বনে, কী কী গাছ হয় দক্ষিণ দেশে।

তারপর কে একজন একটা কাঁচপোকা পেলে। সবাই অমনি সুর ক'রে ছড়া কাটল:

> কাঁচপোকা লজ্জাবতী!
> যা উড়ে যা ইতি উতি!
> নিয়ে আসিস রাঙা মোতি!

কিন্তু লজ্জাবতী কাঁচপোকার ওড়ার কোনো ইচ্ছে দেখা গেল না। তখন হঠাৎ কার যেন খাবার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ভারি খিদে পেয়ে গেল সবার। আর বনের মধ্যে ঘাসের ওপর বসে কী ফুর্তি ক'রেই না সে খাওয়া। মস্ত একটা গাছের গুঁড়ি হল টেবিল। যার যা ছিল সবাই সবার সঙ্গে ভাগাভাগি শুরু ক'রে দিলে। তারপর দিদিমণি যখন তাঁর হাত ব্যাগ থেকে এক বাক্স চকোলেট বার করলেন তখন একেবারে সোনায় সোহাগা। হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল:

'সাপ! সাপ!'

চেঁচালে সেই ওলিয়া মেয়েটি। বসেছিল সে ঘেসো মাঠটার একেবারে ধারে, ছোট্ট বাবার পাশেই। লাফিয়ে উঠেই ক্রমাগত সে চ্যাঁচাতে লাগল:

'সাপ! সাপ!'

লাফিয়ে উঠল ছোট্ট বাবাও। দেখল মেয়েটির কাছেই কিল্‌বিল্‌ করছে সাপ। জীবনে সেই প্রথম সাপ দেখল বাবা, তাই এমন ভয় পেয়ে গেল যে হাতের কোদালটা দিয়ে প্রাণপণে কোপ বসালে। কোদালটা ছিল বেশ ধারালো, সঙ্গে সঙ্গেই দু আধখান হয়ে গেল সাপটা আর প্রতিটি আধখানাই আলাদাভাবে নড়তে শুরু করলে। আঁতকে চেঁচাতে লাগল ওলিয়া। ওলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকটি মেয়ে। চেঁচালেন না শুধু দিদিমণি। শুধু চোখ বড়ো বড়ো ক'রে তিনি তাকিয়ে রইলেন ছোট্ট বাবার দিকে। বাবা তখন প্রাণপণে কোদাল চালাচ্ছে। দুটো সাপ থেকে হল চারটে সাপ। চারটে সাপ থেকে আটটা। হয়ত ষোলো কি বত্রিশটা সাপই হয়ে যেত। কিন্তু দিদিমণি ততক্ষণে এসে বাবার হাত ধরে ফেললেন। বললেন:

'হয়েছে! এটা বিষাক্ত নয়, ঘেসো সাপ। লোকের ক্ষতি করে না, বরং উপকারই করে।'

কোপ বসানো থামাল বাবা। চিল্লানি বন্ধ হল মেয়েদের। শুধু ভোট দিতে ভালোবাসত যে মেয়েটি তার চিৎকার তখনো থামে নি:
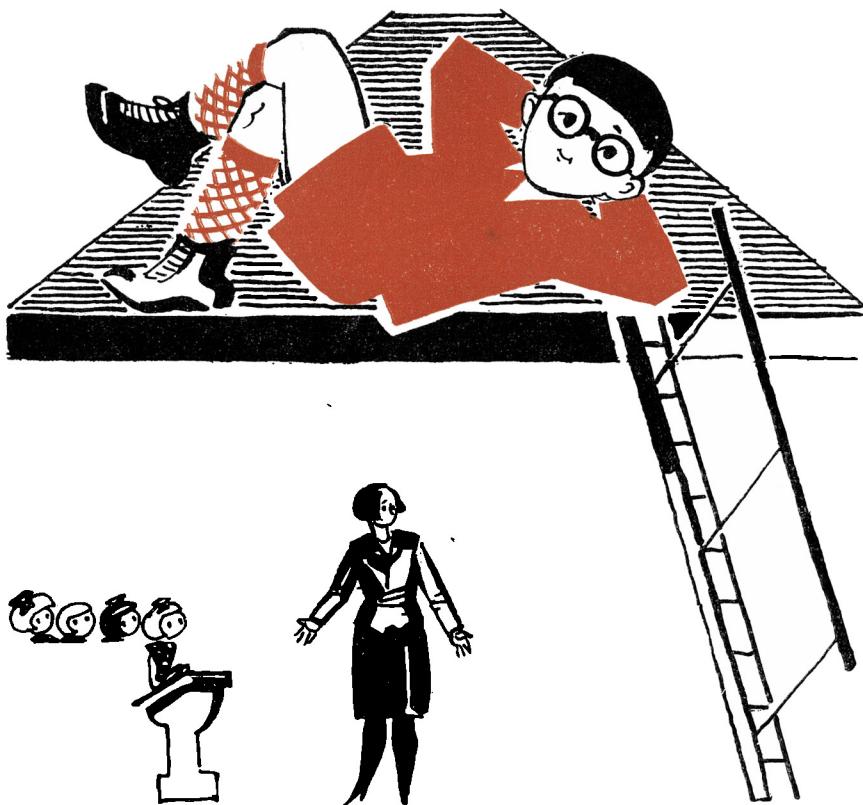
'ওই মাগো! ঘেসো সাপ!'

শুনে সবকটি ছেলেই টিটকারি দিতে লাগল:

'ওই মাগো! ওই বাবাগো! ঘেসো সাপ গো!'

'চুপ!' বললেন দিদিমণি। সবাই চুপ করলে উনি আস্তে আস্তে বললেন, 'এই ধরনের ঘেসো সাপের বিষ নেই। ওরা বরং উপকারই করে, ওদের মারতে হয় না। কোনগুলো বিষাক্ত কোনগুলোর বিষ নেই সেটা জানা দরকার। আর মনে রেখো, অমন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বোকার মতো চ্যাঁচাবে না কখনো। আর বিষাক্ত সাপ ভেবে কেউ যখন না পালিয়ে বন্ধুকে বাঁচাতে যায়, তখন টিটকারি দিতে হয় না। অবিশ্যি সাপকে কেটে একশ টুকরোই করতে হবে, তারও কোনো প্রয়োজন নেই।'

এবার হেসে উঠল সবাই — সব ছেলে, সবকটি মেয়ে। ছোট্ট বাবা গিয়ে তার কোদালটা ছুঁড়ে ফেললে ঝোপের মধ্যে। এরপরেও অনেক দিন ছেলেরা তাকে খেপাত, 'ওই মাগো! ঘেসো সাপ! ওই মাগো! ঘেসো সাপ!' বাবার অবিশ্যি ধারণা ছিল খেপাতে হলে খেপানো উচিত ওলিয়াকে। তবে এরপর থেকে সাপ আর কখনো বাবা মারে নি।

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন নানা বিষয়ে নানা রকম নম্বর পেত বাবা। রুশ ভাষায় পেত ভালো নম্বর, পাটিগণিতে চলনসই, হাতের লেখায় খারাপ। ড্রয়িঙে যাচ্ছেতাই। ড্রয়িং মাস্টার শাসিয়ে রেখেছেন নম্বরটা শীগগিরই শূন্যে গিয়ে থামবে।

একদিন এক নতুন দিদিমণি এলেন ক্লাসে। ভারি সুন্দর দেখতে। হাসিখুশি, অল্প বয়স, পরনে ভারি বাহারে পোষাক। হেসে বললেন:

'আমার নাম ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা। এবার বলো তো তোমাদের কার কী নাম?'

সবাই চ্যাঁচাতে লাগল:

'জেনিয়া!'

'জিনা!'

'লিজা!'

'মিশা!'

'কলিয়া!'

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা কানে আঙুল দিতে সবাই থামল। উনি বললেন:

'আমি তোমাদের জার্মান ভাষা পড়াব। রাজী আছ তো?'

'রাজী! রাজী!' চেঁচাল গোটা ক্লাস।

এই ক'রেই জার্মান ভাষা শেখা শুরু হল বাবার। জার্মান ভাষায় চেয়ার বলতে হলে যে বলতে হবে ডের ষ্টুল, টেবলকে ডের টিশ, বইকে ডাস বুখ, ছেলেকে ডের ক্নাবে, মেয়েকে ডাস মেড্‌হেন — এটায় প্রথম প্রথম বেশ মজা লাগত বাবার।

মনে হত যেন কেমন একটা নতুন খেলা। সে খেলাটা শিখতে সবাই রাজী। কিন্তু যখন সন্ধি বিভক্তি শুরু হল তখন কিছু কিছু ক্নাবে আর মেড্‌হেনের তত ভালো বোধ হল না। বোঝা গেল জার্মান ভাষা শিখতে হবে বেশ মেহনত ক'রে। দেখা গেল খেলাটা পাটিগণিত কি রুশ ভাষার মতোই একটা পাঠ্য বিষয়। জার্মান ভাষায় লেখা, জার্মান ভাষা পড়া এবং জার্মান ভাষায় কথা বলা — তিনটেই একসঙ্গে চালাতে হত। ক্লাসটা যাতে একঘেয়ে না হয় তার জন্যে খুবই চেষ্টা করতেন ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা। মজার মজার গল্পের বই নিয়ে আসতেন ক্লাসে, জার্মান ভাষায় গান গাইতে শেখাতেন, পড়াবার সময় ঠাট্টা তামাশাও করতেন জার্মান ভাষায়। যারা ঠিকমতো পড়াশুনা করত তাদের কাছে সত্যিই ভালো লাগত ক্লাসটা। কিন্তু যারা তেমন নিয়ম ক'রে পড়াশুনা করত না, তারা বুঝতেও পারত না, তাই ভারি ব্যাজার লাগত তাদের কাছে। ফলে 'ডাস বুখ'এর পাতা ওলটাত তারা আরো কম, আর দিদিমণি কিছু জিজ্ঞেস করলে বোবার মতো চুপ করে থাকত। মাঝে মাঝে আবার জার্মান ভাষায় ক্লাস শুরু হয়ে যাবার ঠিক আগেই শুরু হয়ে যেত উদ্দাম চিৎকার, 'ইখ্‌ হাবে শপাৎসিরেন!' অনুবাদ করলে মানেটা দাঁড়ায়, 'আমার আছে বেড়ানো!' আর ইশকুল ছাত্রদের কাছে তার অর্থ, 'চল, ক্লাস ফাঁকি দিই।' সে চিৎকার শুনে বহু ছাত্রই ধুয়া ধরত, 'শপাৎসিরেন! শপাৎসিরেন!' বেচারী ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা ক্লাসে এসে দেখতেন যে ছেলেরা সবাই গেছে 'শপাৎসিরেনে', ডেস্কে বসে আছে কেবল মেয়েরা। বোঝাই যায়, এতে ভারি দুঃখ হত তাঁর। কিন্তু ছোট্ট বাবাও বেশির ভাগ সময়েই 'শপাৎসিরেন' চালাত।

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার মনে কষ্ট দেবার কোনো ইচ্ছে ছিল না তার। তবে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ইশকুলের হেড মাস্টার আর মাস্টারদের চোখ এড়িয়ে চিলেকোঠায় লুকিয়ে থাকতে লাগত

বেশ ভালো। অন্ততপক্ষে পড়া না ক'রে ক্লাসে বসে থাকা আর ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা যখন প্রশ্ন করতেন, 'হাবেন জি ডের ফেডেরমেসের? (তোমার কাছে পেন্সিল কাটা ছুরি আছে কি?)' তখন অনেক ভেবেচিন্তে 'ইখ নিখ্‌ট...' (বা বোকার মতো 'আমি না...') জবাব দেবার চাইতে সেটা অনেক ভালো। ছোট্ট বাবা যখন ওই জবাবটা দেয় তখন সারা ক্লাস হোহো ক'রে হেসে ওঠে। তারপর হাসি শুরু হয় সারা ইশকুলে। আর কেউ বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে সেটা বাবার মোটেই পছন্দ হত না। বরং অন্যকে নিয়ে হাসাটাই বাবার বেশি পছন্দসই। ঘটে বুদ্ধি থাকলে অবশ্য জার্মান ভাষায় মন দিলেই সব চুকে যেত। কেউ আর তখন বাবাকে নিয়ে হাসত না। কিন্তু তার বদলে ভারি রাগ হয়ে গেল বাবার। রাগ হয়ে গেল দিদিমণির ওপর, জার্মান ভাষার ওপর। জার্মান ভাষার ওপর প্রতিশোধ নিলে বাবা। কখনোই ও ভাষাটায় মন দিত না সে। তারপর অন্য ইশকুলে ফরাসী ভাষা যখন শিখতে হল তখনো উচিতমতো পড়লে না সে ভাষাটা। তারপর কলেজে গিয়ে ইংরাজি ভাষা শেখার পালা, সেটাও পড়লে না। আর এখন প্রায় একটা বিদেশী ভাষাও বাবা জানে না। প্রতিশোধটা তাহলে নেওয়া হল কার ওপর? নিজের ওপরই যে প্রতিশোধ নিয়েছে সেটা এখন টের পেয়েছে বাবা। অনেক ভালো ভালো বই যে ভাষায় লেখা হয়েছিল সেটা সেই ভাষাতেই পড়ার সাধ্যি নেই বাবার। বিদেশে সফর করার ভারি ইচ্ছে হয় তার, কিন্তু একটা ভাষাতেও কথা বলবার শক্তি না থাকায় লজ্জা হয় যাতে। অনেক সময় অন্যান্য দেশের নানা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় বাবার। রুশ ভাষা তারা ভালো জানে না বটে, কিন্তু শিখছে। সবাই তারা জিজ্ঞেস করে, 'প্রেখেন জি ডইচ?' (জার্মান ভাষা জানেন?), 'পার্লে ভু ফ্রাঁসে?' (ফরাসী ভাষা?), 'ডু ইউ স্পিক ইঙ্গলিশ?' বাবা কেবল হাত উলটিয়ে মাথা নাড়ে। কী আর জবাব দেবে। শুধু 'ইখ নিখ্‌ট...' ভারি এখন লজ্জা হয় বাবার।

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন ভাসিয়া সেরেদিন নামে তার এক বন্ধু ছিল। ভাসিয়ার বাড়িটা ছিল কাছেই। একসঙ্গেই ইশকুলে যেত তারা, একসঙ্গেই বাড়ি ফিরত। ইশকুলেও বসত একই ডেস্কে। অঙ্কের ক্লাসে ভাসিয়া অঙ্ক কষত সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। ছোট্ট বাবাকে সে অঙ্ক দেখিয়ে দিত। আর বাবা তাকে সাহায্য করত কবিতা শেখায়, প্রবন্ধ লেখায়। তাই ভারি ভাব ছিল দুজনে। এমন কি মারপিটও তারা করত কেবল নিজেদের মধ্যেই।

একদিন গোটা ক্লাসের জন্যে টাস্ক দিলেন দিদিমণি। 'কী ক'রে গ্রীষ্ম কাটালাম' এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে। ভাসিয়া সেরেদিন বাবাকে বললে:

'কী যে লিখব ছাই মাথায় আসছে না...'

ছোট্ট বাবা জিজ্ঞেস করলে:

'গরমকালে কোথায় ছিলি?'

'গাঁয়ে,' বললে ভাসিয়া।

'গাঁয়ের কথাই লেখ তাহলে।'

'কিন্তু লিখব কী?'

'গ্রীষ্মে কী তুই করেছিলি সেখানে?'

'কিছুই করি নি... নদীতে চান করতাম, দল বেঁধে মাছ ধরতাম, বনে বনে ঘুরতাম...'

'বেশ তো, এই সবই লিখে দে...' বললে ছোট্ট বাবা।

ভাসিয়া সেরোদিন খুবই চটপট তার প্রবন্ধ লিখে বাবাকে দেখালে। তার রচনাটি এই:

কী ক'রে গ্রীষ্মকাল কাটালাম

গ্রীষ্মকালে আমি ছিলাম গাঁয়ে দিদিমার কাছে। চান করতাম, মাছ ধরতাম, ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে বনে ঘুরতাম। গ্রীষ্মকালে গাঁয়ে বেশ লাগে।

ভাসিয়া সেরোদিন

'এ আবার কী রচনা?' বললে ছোট্ট বাবা, 'দিদিমার কথা লেখ। কী রকম দেখতে, কী বলতেন, কী করতেন, কী গান গাইতেন...'

'গান গাইত না, গল্প শোনাত,' বললে ভাসিয়া।

'বেশ তো, সেই গল্পের কথাই বল। সঙ্গীসাথীরা কেমন ছিল সেটাও খানিক লেখ। নদীর বর্ণনা দে, বনের বর্ণনা দে।'

'ও আমার ঠিক আসে না,' বললে ভাসিয়া, 'আমি বরং তোকে বলি, তুই লিখে দিস।'

ভাসিয়া তার দিদিমার কথা, সঙ্গীসাথীদের কথা, বন নদীর কথা সব বললে বাবাকে। মস্ত এক রচনা লিখল বাবা। বেশ খেটে লিখেছিল। রচনাটাও দাঁড়াল সুন্দর। ভারি খুশি হল ভাসিয়া। বললে:

'আমি টুকে নিচ্ছি। তুই এবার নিজের রচনাটা লেখ। নয়ত সময় হবে না।'

ভাসিয়া চলে গেল, নিজের রচনা লিখতে বসল ছোট্ট বাবা, কিন্তু তেমন সুবিধা হল না। একই রচনা দু'বার লেখা তো আর সহজ নয়। ছোট্ট বাবাও গরমে গিয়েছিল গাঁয়ে, বনে নদীতে সেও ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু সে সবই তো সে লিখে দিয়েছে ভাসিয়ার হয়ে। এখন শুধু তার একটি ভাবনা: এমন রচনা লিখতে হবে যা ভাসিয়ার মতো না হয়, কিন্তু কী ক'রে? নয়ত দিদিমণি চট ক'রেই ধরে ফেলবেন যে রচনা দুটো তারই লেখা। নিজের লেখাটা ভালো হবে

কি মন্দ হবে সেদিকে আর নজর দেবার সময় নেই। এবং শেষ পর্যন্ত যে রচনাটি বাবা লিখলে সেটি আদৌ ভাসিয়ার মতো হল না। বলতে কি, দিদিমণি বললেন, সেটি একেবারেই বিশ্ব বহির্ভূত।

হোম টাস্কের খাতা ফেরত দিয়ে দিদিমণি বললেন:

'এই নাও তোমাদের রচনা। সবচেয়ে ভালো লিখেছে ভাসিয়া সেরেদিন। ওর লেখাটা আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি।'

দিদিমণি বাবার প্রথম রচনাটা পড়ে শোনালেন, যেটি বাবা লিখে দিয়েছিল ভাসিয়ার জন্যে।

দিদিমণি বললেন:

'সাবাস ভাসিয়া! খুব ভালো লিখেছ। বেশ জীবন্ত, ভুল ভ্রান্তি নেই। সুন্দর তোমার দিদিমা! বন্ধুবান্ধবরাও খাসা!'

এই বলে দিদিমণি কেন জানি তাকালেন বাবার দিকে। ভয়ানক লাল হয়ে উঠল ভাসিয়া সেরেদিন। কেউ তাকে খামোকা প্রশংসা করলে তার ভালো লাগত না। দিদিমণি তারপর বললেন:

'এইবার সবচেয়ে খারাপ রচনাটা আমি পড়ে শোনাব।' এই ব'লে বাবা দ্বিতীয়বার যে রচনাটি লিখেছিল সেটি পড়ে শোনালেন। এবার লাল হয়ে উঠল বাবা। খামোকা কেউ তাকে তিরস্কার করলে ভারি বিচ্ছিরি লাগত বাবার। ভারি লজ্জা লাগল তার।

বাবার রচনা পড়ে শুনিয়ে দিদিমণি বললেন:

'পরের বার যেন আরো ভালো হয় তোমার রচনা, ভাসিয়ার রচনাও যেন খারাপ না হয়, বুঝেছ?'

'বুঝেছি...' আস্তে ক'রে বললে বাবা।

'আর ভাসিয়া?' জিজ্ঞেস করলেন দিদিমণি।

ভাসিয়াও আস্তে ক'রে বললে:

'বুঝেছি...'

দুজনেই বসে আছে লাল হয়ে, সারা ক্লাস তাকিয়ে দেখছে তাদের দিকে, কিছুই বুঝতে পারছে না। বাবা আর ভাসিয়া যে তারপর নিজেরা কোনো রকম যুক্তি করেছিল তা নয়। কিন্তু সেই থেকে অঙ্কের ক্লাসে বাবা নিজেই অঙ্ক কষত, আর ভাসিয়া রচনা লিখত বাবার সাহায্য না নিয়েই। প্রথম দিকে অবিশ্যি প্রায়ই ভুল হত বাবার, ভাসিয়ার রচনাও তেমন ভালো দাঁড়াত না। কিন্তু পরের দিকে মুশকিল কেটে গিয়েছিল। দুজনেই বুঝলে, সবকিছুই নিজের হাতে না করলে কিছুই শেখা যায় না। তারপর থেকে একই ডেস্কে আরো অনেকদিন কেটেছে তাদের।

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন একবার কবি মায়াকোভস্কির সঙ্গে বাবা কথা বলে। মানে মায়াকোভস্কিই কথা বলেন বাবার সঙ্গে। ব্যাপারটা এই।

একবার ছোট্ট বাবা একটা কবিতা লিখলে 'খনিমজুর'। লিখে দিদিমণিকে সেটা দেখালে। দিদিমণি কবিতাটা পড়ে বললেন:

'আমাদের ইশকুলে কেউ কবিতা লেখে না। তাই তোর কবিতাটাই দেয়াল পত্রিকায় দেব। কবিতাটা লিখেছিস, বাহবা দিচ্ছি। তবে ভাবিস না তুই পুশকিন। ভুলিস না কিন্তু।'

ছোট্ট বাবাও কথা দিলে যে সে কখনো নিজেকে পুশকিন বলে ভাববে না।

কবিতাটা প্রকাশিত হল। দেয়াল পত্রিকাটা পড়লে গোটা ইশকুল। সবাই জানল যে তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছেলে কবিতা লেখে। ছোট্ট বাবার খুবই তারিফ করলে মাস্টাররা। ছেলেরা বাবাকে খেপাত, 'নেই-কাটলেট কবি!' কথাটায় যে তারা কী বোঝাতে চাইত সেটা আজ পর্যন্ত বাবা জানে না। উঁচু ক্লাসের সব মেয়েই বাবাকে বলত তাদের অটোগ্রাফ খাতায় কবিতা লিখতে। আর দেয়াল পত্রিকার সম্পাদক ঘোষণা করলে:

'একটা ক'রে কবিতা দিবি প্রত্যেক সংখ্যায়! নইলে — দেখেছিস তো!' ব'লে ঘুষি দেখালে।

এরকম সম্পাদক পাওয়া যে ভাগ্যের কথা সেটা বাবা বুঝেছে বড়ো হয়ে। তখন কিন্তু ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছিল বাবা। সম্পাদকটি সপ্তম শ্রেণীর এক ছোকরা। ইয়া চেহারা। তার ঘুষিকে ভয় পাবে না এমন কেউ নেই। সুতরাং দেয়াল পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় বেরুতে থাকল বাবার কবিতা। আর সম্পাদকের দুই হাতে যেহেতু দুটি ঘুষি মারা সম্ভব, তাই কোনো কোনো সংখ্যায় দুটি ক'রে কবিতাও স্থান লাভ করত।

দুনিয়ায় যত রাজ্যের বিষয় আছে সব নিয়েই কবিতা লিখত বাবা। শীত গ্রীষ্ম শরৎ বসন্ত সব নিয়েই কবিতা হল। প্যারিস কমিউন নিয়েও কবিতা ছিল। ব্যঙ্গ কবিতা লেখা হল গুন্ডাছেলেদের নিয়ে, পরীক্ষার খাতায় নকল করা নিয়ে। লেখা হল 'পুগাচভ বিদ্রোহ' নিয়েও এক কবিতা — অর্থাৎ রসায়ন ক্লাস থেকে গোটা ষষ্ঠ শ্রেণী কী ভাবে চলে যায়। রসায়ন মাস্টারের উপাধিটা ছিল পুগাচভ। দু বছরের মধ্যেই ছোট্ট বাবা অনেক কবিতা লিখে ফেললে। সেগুলো ভালো কি মন্দ সেটা অবশ্য বাবা জানত না। ইশকুলে সবাই তাকে বাহবা দিত, কিন্তু বাবার ধারণা ছিল সেগুলো ঠিক খাঁটি কবিতা নয়। তাই সত্যিকারের কবিতা বাবা কখনো লিখতে পারবে কিনা সেটা জানার ভারি ইচ্ছে হত তার। কিন্তু সে কথা তাকে বলবে কে? সন্দেহ নেই যে তা বলতে পারে কেবল সত্যিকারেরই কোনো কবি। সবচেয়ে যে ভালো, সবচেয়ে যে নামকরা। অর্থাৎ মায়াকোভস্কি।

ছোট্ট বাবা তার সেরা কবিতাগুলো গুছিয়ে ঠিক করলে মায়াকোভস্কিকে দেখাবে। কিন্তু মায়াকোভস্কির কাছে গিয়ে হাজির হওয়া — সেটা ঠিক সাহসে কুলুচ্ছিল না। বাবা তো তখনো ভারি ছোটো কিনা। তাই ঠিক করলে টেলিফোন করবে। টেলিফোন গাইডে সে বার করলে মায়াকোভস্কির নম্বরটা। তারপর পর পর কয়েক সন্ধ্যা সুযোগ বুঝে, বাড়িতে যখন কেউ নেই, ছোট্ট বাবা তার কবিতাগুলো টেবিলে সাজিয়ে সাহসে বুক বেঁধে টেলিফোন রিসিভার তুলে নম্বরটা বলত... এবং আবার রিসিভার রেখে দিত। খোদ মায়াকোভস্কির সঙ্গে কথা বলার সাহস ঠিক হত না। প্রতি সপ্তাহে পর পর কয়েকবার এমনি চলল। ভারি লজ্জা লাগত বাবার।

শেষ পর্যন্ত একদিন রবিবার সন্ধ্যায় ঠাকুর্দা ঠাকুমা থিয়েটারে গেছেন, বাবাও সেই সুযোগে টেলিফোন করল মায়াকোভস্কিকে এবং রিসিভার নামিয়ে রাখলে না। কানে এল গাঢ়, গমগমে একটা গলার স্বর, সারা জীবন সে স্বরের কথা মনে আছে বাবার। পরে কত লেখা কত গল্প শুনেছে মায়াকোভস্কির গলা নিয়ে। সে সন্ধ্যায় কিন্তু সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ছিল কেমন যেন উগ্র।

'হ্যালো, কে বলছেন?'

ঘাবড়ে গেল বাবা, কেমন যেন খাবি খেয়ে কিছুই বলতে পারলে না। কণ্ঠ ওদিকে গর্জন করছে:

'ফাজলামি করা হচ্ছে? আচ্ছা চীজ তো, রোজ সন্ধ্যেয় কেবল টেলিফোন! টেলিফোন ক'রে চুপ মেরে থাকবে, জ্বালাতনের এক শেষ! তা বলো কিছু একটা! কী গাইবে গেয়ে নাও বাছাধন, লজ্জা কী!'

ছোট্ট বাবা এমনি ঘাবড়ে গেল যে আতঙ্কে রিসিভার নামিয়ে রাখার কথাও মনে রইল না। একটু মাপ চাইবে, নমস্কার জানাবে, কৈফিয়ৎ দেবে, কিছু একটা বলবে — সে সুযোগ অনেক আগেই কেটে গেছে... এখন শুধু চুপ ক'রে শোনা ছাড়া করবার কিছুই নেই। তাই শুনেই গেল বাবা।

'বিদায় হে চুপচন্দ্র! ফের যদি কখনো টেলিফোন করো তাহলে টের পাইয়ে ছাড়ব!'

রিসিভার ছেড়ে দিলেন মায়াকোভস্কি। এরপর আর কখনো তাঁকে টেলিফোন করতে যায় নি বাবা। মায়াকোভস্কির সঙ্গে এরপর জীবনে তার দেখাও হয় নি কখনো, কথাও বলে নি। এই কেলেঙ্কারি ঘটনাটার কথাটা পর্যন্ত সে কাউকে জানায় নি। বহুদিন পর্যন্ত এই আলাপটার কথা জানত কেবল দুজন লোক: ছোট্ট বাবা নিজে আর মায়াকোভস্কি। তারপর জানত শুধু একা বাবা। কিন্তু মায়াকোভস্কির সঙ্গে আলাপের এ কথাগুলো তার স্পষ্ট মনে আছে। এবার তোমাদেরও সে কথা জানা রইল।

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন একবার অন্য একটা ইশকুল থেকে তাদের নেমন্তন্ন হল সান্ধ্য বাসরে। কিছুদিন আগে সে ইশকুলের ছেলেমেয়েরাও তাদের গুণপনা দেখিয়ে গিয়েছিল বাবাদের ইশকুলের সান্ধ্য বাসরে। গান গায় তারা, নাচে, কবিতা আবৃত্তি করে, শারীরিক কসরৎ দেখায়। এমন কি পুশকিনের 'বরিস গদুনভ' নাটক থেকে সরাইখানার দৃশ্যটাও অভিনয় ক'রে দেখায়। গ্রিগোরি অত্রেপিয়েভ অবশ্য জানলা দিয়ে লাফাবার সময় পা আটকে গোটা সরাইখানাটাকেই ধূলিসাৎ করে দেয় তা সত্যি। তবে সে তো যে কোনো লোকের বেলাতেই হতে পারে। কিন্তু অভিনয় করেছিল চমৎকার। এবার ওদের ইশকুলে গিয়ে দেখাতে

হবে নিজেদের গুণপনা। সবারই ইচ্ছে হচ্ছিল, অবাক ক'রে দিতে হবে। কিন্তু কী ক'রে? সবাই বলাবলি করলে:

'আমরা গান গাইব, ওরাও গান গায়। নাচব, ওরাও নাচে। নাচে বরং আমাদের চেয়ে ভালোই। ব্যায়ামের কসরৎ আমাদের খারাপ নয়। আমাদের পিরামিড যদি ভেঙে পড়ে, তাতে কী হয়েছে। ওদের সরাইখানাও তো ভেঙে পড়েছিল। আমরা আবৃত্তি করব। ওরাও আবৃত্তি করেছে। এমন কী আছে যেটা ওরা পারে না, আমরা পারি?'

সবাই তখন ভাবতে বসল। ভাবল অনেকক্ষণ ধ'রে।

'গর্বুশ্কা আছে আমাদের,' কে যেন বললে।

সবাই তখন হাসাহাসি চেঁচামেচি শুরু করে দিলে:

'কুকুর ডাকতে পারে ও!'

'বেড়াল ডাকতে পারে!'

'মোরগ ডাকতে পারে!'

'পি-কক হয়ে হাঁটতে পারে!'

'দড়ির ওপর হাঁটতে পারে!'

'আস্তে!' বললেন দিদিমণি।

সবাই চুপ করতে গর্বুশ্কা বললে:

'ও আর কী... ও তো সবাই পারে... যদি কবিতা লিখতে পারতাম, তবে না...'

এই বলে সে তাকাল ছোট্ট বাবার দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ফেরাল সবাই। দিদিমণি বললেন:

'ঠিক কথা! আমাদের যে কবি আছে।'

'আর ওদের নেই!' চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

বাবা বললে যে স্টেজে দাঁড়িয়ে কিছুই সে কখনো বলে নি, তাতে আবার অন্য ইশকুলে, তাতে আবার নিজের লেখা কবিতা, তাতে আবার...

'তাতে কী হয়েছে! কিছু ভাবিস না!' চেঁচাল সবাই।

দিদিমণি বললেন:

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে মনে রাখিস, তুই পুশকিন ন'স।'

কথাটা তিনি বাবাকে প্রায়ই বলতেন, বাবাও কখনো সেটা ভোলে নি।

অবশেষে এল সেই ভয়ঙ্কর দিন। ব্যায়ামবীর, গায়ক আর নর্তকদের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে ছোট্ট বাবা চলল অন্য ইশকুলে। অচেনা এক মঞ্চে উঠে অচেনা এক হলঘরের দিকে তাকাল। অচেনা ছেলে অচেনা মেয়েয় হলটা ভরা। সামনের সারিতে বসে আছেন অচেনা এক হেড

মাস্টার, অচেনা সব মাস্টার। অচেনা সব চোখে তারা তাকিয়ে দেখছে মঞ্চের দিকে, হাসছে অচেনা কোন হাসি। ছোট্ট বাবার বুকের কাঁপুনি বেড়ে উঠতে লাগল কেবলি। তোমরা অবিশ্যি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কী। নেহাৎ সাধারণ সব ছেলেমেয়ে, সাধারণ সব মাস্টার মশাই দিদিমণিরাই বসে ছিল বৈকি। তাকিয়ে দেখছিল তারা, হাসছিল, হাততালি দিচ্ছিল — ঠিক বাবাদের ইশকুলে যেমন হয়েছিল তেমনি। পরের ইশকুলে গিয়ে স্টেজে আবৃত্তি করতে বাবার এতই ভয় হচ্ছিল যে মনে হল চারিপাশের সবই যেন কেমন বিদঘুটে।

সদাবিশ্বস্ত গবুর্শকা বসেছিল পাশেই। খামোকাই সে ফিস ফিস করলে:

'অন্য ইশকুল! অন্য ইশকুল তো হয়েছে কী। লোক তো সব একই রকম...'

খামোকাই তাকে চকোলেট খাওয়ালে মেয়েরা। খামোকাই দিদিমণি ধমকালেন:

'ছিঃ লজ্জা করে না। কবিতাটা অন্তত মনে আছে তো?'

'মনে আছে...' কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে জবাব দিলে বাবা।

শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত এসে গেল। মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হল:

'এবার কবিতা শোনাবে আমাদের ইশকুলের ছাত্রকবি! নিজের লেখা কবিতা।'

হাততালি পড়ে গেল হলঘরে, গবুর্শকা ঠেলা দিলে বাবার পিঠে। আড়ষ্ট পা দুখানা টেনে কোনোক্রমে মঞ্চে এসে দাঁড়াল বাবা। এমন ভয় সে আর কখনো পায় নি। চোখের সামনে সবকিছু ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, আর কানের মধ্যে সমতালে যে আওয়াজটা হচ্ছে সেটা ঠিক সাগরের ঢেউয়ের মতো।

চোখের সামনে কোনো লোক দেখতে পাচ্ছিল না বাবা, কাঁপছে শুধু নানা রঙের একটা প্রকাণ্ড পিণ্ড। হাততালি পড়ল। তারপর চুপ হয়ে গেল হলঘর। কবিতা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। ছোট্ট বাবা কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে, মুখে রা নেই। গবুর্শকা পরে বলেছিল যে ছোট্ট বাবা নাকি প্রথমটা একেবারে শাদা মেরে যায়। তারপর নীল হয়ে ওঠে। তারপর সবুজ, আর সারা মুখে ফুটে ওঠে লাল লাল ছোপ।

'একেবারে যেন ঠিক আতসবাজি!' বলেছিল গবুর্শকা, 'বাজি রেখে বলতে পারি, ওদের ইশকুলে অমন কেরদানি কেউ দেখাতে পারবে না।'

হঠাৎ কে যেন হেসে উঠল হলঘরে। ভাঙা গলায় কবিতা শুরু করলে বাবা। নিজেদের ইশকুলের জন্যে একটা স্কুল প্রশস্তি লিখেছিল বাবা, আবৃত্তি করলে সেইটে। প্রথমটা সবাই শুনলে মন দিয়েই। কিন্তু ধুয়ার জায়গাটায় গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আসলে ধুয়াটা ছিল এই রকম:

রবিন হুডের সাহস নিয়ে
ঘুরে দ্যাখো বিশ্বময়,
তেইশ নং স্কুলের মতো
পাবে নাকো বিদ্যালয়!

নিজেরাই ভেবে দ্যাখো, এ কবিতা বাবা পড়ছে নয় নম্বর ইশকুলে, সেখানকার ছেলেরা কি কখনো এতে সায় দিতে পারে? নিজেদের ইশকুলকে তো ওরা আর ছোটো করতে পারে না, তাই পা ঠুকতে লাগল সবাই, 'হু' দিতে লাগল। আতঙ্কে ছোট্ট বাবা ভেবে পেল না ব্যাপার কী। হাত তুলে সে বললে:

'স্তবকের মাঝখানে বাধা দিও না। স্তবকটা অন্তত শেষ পর্যন্ত পড়তে দাও, তারপর যত খুশি চেঁচিয়ো।'

সঙ্গে সঙ্গেই চুপ হয়ে গেল হলঘর। ছোট্ট বাবা তখনো বোঝে নি যে এরকম অনুরোধ ক'রে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা হল। কেননা নয় নম্বর ইশকুলের ছাত্ররা ছিল ভারি তুখোড়, বাকি আবৃত্তিটাকে তারা ক'রে তুললে এক মজার খেলা। এক একটা স্তবকটা বাবা যতক্ষণ পড়ছিল, ততক্ষণ চুপ ক'রে থাকছিল সবাই। কিন্তু প্রতিটি স্তবক শেষ হতেই যা শুরু হচ্ছিল, সে এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। গোটা হলঘর ভরে উঠছিল চিৎকার, বেড়াল ডাক, শিস আর পা ঠোকার শব্দে। তারপর আবার শান্ত হয়ে যাচ্ছিল সবাই। তোতলাতে তোতলাতে পরের স্তবক শোনাল বাবা। অমনি শুরু হয়ে গেল ঠিক আগের মতো কাণ্ড। ওদিকে স্তবকও কম ছিল না কবিতায়। যন্ত্রের মতো জেদ ক'রে শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি ক'রে গেল বাবা। যখন শেষ হল, তখন হলঘরে, মঞ্চের পেছনে, নিজেদের লোক, পরের লোক সবাই লুটিয়ে পড়ছে হেসে। গর্দুশ্কা তো একেবারে গড়াগড়িই দিতে লাগল মেজের ওপর। এমন কি দিদিমণিও না হেসে পারলেন না। আজো পর্যন্ত বাবা এ লজ্জা ভুলতে পারে নি। অনেক দিন কেটে গেছে। ছোটো বাবা বড়ো হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মাঝে মাঝে রাস্তায় হঠাৎ কে এক অচেনা বয়স্ক লোক বাবাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, 'রবিন হুডের সাহস নিয়ে!' তারপর বেড়াল ডেকে উধাও হয়ে যায়। বাবার বুঝতে দেরি হয় না যে বয়স্ক ওই লোকটি যখন ছোটো ছিল তখন নিশ্চয় পড়ত নয় নম্বর ইশকুলে। বাবার কবিতার লাইনটা তার মনে থেকে গেছে। তবে বাবাও তো কখনো ভোলে নি যে সে পুশকিন নয়...

পিঙ-পঙ খেলা

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন এক নতুন খেলার চল হল। এখন তাকে বলে টেবিল টেনিস। তখন কিন্তু তার নাম ছিল পিঙ-পঙ। এখনো খেলাটা অনেক ছেলেমেয়েই ভালোবাসে। কিন্তু তখন পিঙ-পঙ খেলা হত প্রতিটি ইশকুলে, প্রতিটি ক্লাসে, প্রতিটি আঙিনায়। খেলা চলত টেবিলের ওপর, বেঞ্চির ওপর, পিয়ানোর ওপর, এমন কি স্রেফ মেঝের ওপরেও। আর সে খেলা চলত সকাল থেকে সন্ধে। কেউ কেউ আবার রাতেও ছাড়ত না। অনেকেই দুনিয়ায় পিঙ-পঙ ছাড়া আর সবই ভুলে গেল। ছোট্ট বাবার ইশকুলে চলত রোজই পিঙ-পঙ প্রতিযোগিতা। প্রথমে বাছা হত এক একটা গ্রুপের

মধ্যে প্রথম। তারপর প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত ইশকুলের মধ্যে প্রথম স্থান নিয়ে। তারপর ইশকুলের চ্যাম্পিয়নরা খেলত পাড়া চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যে। তারপর গোটা শহরের চ্যাম্পিয়নশিপ। তারপর খেলা হত মস্কোর সঙ্গে লেনিনগ্রাদের।

শুনে ভারি আশ্চর্য লাগত বাবার। ছোট্ট শাদা বলটাকে হাতাটা দিয়ে পেটানোয় অত কী মজা থাকতে পারে সেটা বাবা ভেবে পেত না।

'হাতা নয় রে, র‍্যাকেট,' বলত ছেলেরা।

'নয় র‍্যাকেটই হল। কিন্তু তাতে কী?'

'খেলে দ্যাখ।'

'কোনো মজা নেই।'

'মজা লাগবে পরে।'

'কখখনো না।'

'খেলেই দ্যাখ না।'

'সাধ নেই।'

তবে কতদিন আর এই ধরনের আলাপ চলতে পারে। তাই, স্বভাবতই, এক শুভদিনে ছোট্ট বাবা পিঙ-পঙ ব্যাট নিয়ে এগুল টেবলের দিকে। আর সেই হল তার কাল। বললাম বটে শুভদিন। কিন্তু ছোট্ট বাবার বাড়ির লোকেদের মতে, অতি অশুভ দিন। আসলে পিঙ-পঙ খেলাটা বাবার ভারি ভালো লেগে যায়। প্রথমটা কিছুই পারছিল না অবশ্য। ব্যাট দিয়ে বলটার নাগাল মিলছিল না কিছুতেই। পরে ক্রমশ ব্যাটের আওতায় পাওয়া গেল বলটাকে। কিন্তু কিছুতেই ঠিকমতো টেবলে ফেরত পাঠানো যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত টেবলেও বল পেঁছিতে লাগল এবং হঠাৎ ভারি ভালো লেগে গেল খেলাটা। দেখা গেল ট্যাঞ্জেণ্ট, স্পিন নানা কায়দার মার আছে। সে সব মারের পর বলটা হঠাৎ কখনো দিক পালটায়, কখনো বা ভয়ানক আস্তে যায়, কখনো প্রচণ্ড জোরে। ভালো খেলুড়ের লক্ষ্য থাকে এমন ভাবে বল দেবে যাতে প্রতিপক্ষ সবচেয়ে অসুবিধার মধ্যে পড়ে। এখনো পর্যন্ত বাবার ধারণা পিঙ-পঙ অতি সুন্দর খেলা। কিন্তু ছেলেবেলায় বাবার কাছে পিঙ-পঙ হয়ে উঠেছিল তার একমাত্র ধ্যান। বই পড়া চুলোয় গেল, ক্লাসের পড়ায় মন নেই। ইশকুলে যে যেত সেটাও লেখা পড়ার জন্যে নয়, নিজের পেয়ারের খেলাটি খেলতে। খেলা তার ক্রমেই ভালো হতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হতে লাগল পড়াশুনা।

দিদিমণি কয়েক বার বাবাকে এই নিয়ে বলেন। বলতেন, সবেরই একটা মাত্রা আছে। প্রবাদ শোনাতেন: 'বাজে কাজে এক ঘণ্টা, আসল কাজে গোটা মনটা!'

ছোট্ট বাবা কোনো তর্ক করত না। কী দরকার? বাবার কাছে যে পিঙ-পঙটাই কাজের মতো কাজ, বাকি সবই বাজে, সেটা তো আর দিদিমণি বুঝবেন না। পিঙ-পঙ সে খেলত সবচেয়ে বেশিক্ষণ ধ'রে। অনেককেই হারিয়ে দেয় বাবা। কিন্তু যখন ইশকুলে তিন নম্বর খেলোয়াড়কে সে হারাল, সেদিন দিদিমণি বললেন:

'এ ভাবে আর চলে না! তোর মা-বাবার সঙ্গে কথা কইতে হবে।'

ঠাকুর্দা ঠাকুমার কাছে চিঠি লিখলেন তিনি। সে চিঠি কিন্তু তাঁরা পেলেন না। ছোট্ট বাবা নিজেই সে চিঠিটি লেটার বক্স থেকে বার ক'রে নিজে প'ড়ে নিজেই ছিঁড়ে ফেলে। ছেঁড়ে একেবারে কুটিকুটি ক'রে — এতই খারাপ লেগেছিল চিঠিটা। দ্বিতীয় চিঠি পাঠালেন দিদিমণি। সে চিঠিটা বাবার পছন্দ হল আরো কম। তাই আরো কুটিকুটি ক'রে সেটা ছেঁড়া হল।

এ কথা বলতে আমার এখনো লজ্জা হয়। কিন্তু লুকিয়ে তো লাভ নেই।

ঠাকুর্দা ঠাকুমা আসছেন না দেখে দিদিমণির ভারি অবাক লাগল। কিন্তু তৃতীয় চিঠি তিনি যখন লিখলেন, ততদিনে ইশকুলের চ্যাম্পিয়নকেই হারিয়ে দিয়েছে বাবা। সুতরাং বাবা স্থির করল, এরপর ইশকুলে তার করবার কিছুই নেই। একেবারেই ইশকুলে যাওয়া ছেড়ে দিলে সে। সকালে ভান করত যেন পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে খাতাও থাকত না, বই-ও থাকত না। থাকত শুধু পিঙ-পঙের দুটি ব্যাট নেট আর তিনটি বল। আর থাকত কিছু জলখাবার, যেটি বাবা খেত দুপুরের খাওয়ার সময়। তারপর সারা দিন চলত পিঙ-পঙ খেলা। অনেক নতুন নতুন বন্ধু জুটল বাবার, সবাই পিঙ-পঙ ভক্ত। মস্কোর সমস্ত চ্যাম্পিয়নদেরই সে মুখ চিনে ফেললে। বিখ্যাত ফালকেভিচ ভাইয়েরা তাকে দেখলে নমস্কার জানাত। তরুণ টিমে প্রবেশাধিকারও জুটল বাবার এবং প্রতিযোগিতার প্রথম খেলাটাতে হারও হল। অনেক কিছুই হল বাবার... কিন্তু এই সময় চিঠির উত্তর না পেয়ে এবং ইশকুলে বাবাকে না দেখতে পেয়ে দিদিমণি নিজেই এসে হাজির হন বাড়িতে। ছোট্ট বাবা বাড়ি ছিল না, তার বদলে ছিলেন ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা। ছেলে তাঁদের অনেক দিন থেকেই ইশকুলে যাচ্ছে না, সারা দিন কেবল কী এক বল পিটছে, এ খবর শুনে আঁতকে উঠলেন তাঁরা। ভাবলেন নিশ্চয় ছেলের মাথা খারাপ হয়েছে। নিজেরা তো তাঁরা কখনো পিঙ-পঙ খেলেন নি। ব্যাট কেড়ে নিয়ে, বল লুকিয়ে রেখে তাঁরা বাবাকে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। সাধারণ ডাক্তার নয়, মস্ত নামকরা এক প্রফেসর। সারা জীবন ধ'রে এ প্রফেসর পাগলাদের চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু ইনিও জীবনে কখনো পিঙ-পঙ খেলেন নি। ছোট্ট বাবা পিঙ-পঙের নেশায় পড়াশুনা ছাড়তে পারে এটা তাঁরও বিশ্বাস হচ্ছিল না। আর ছোট্ট বাবাও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কেন এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করা হচ্ছে তাকে। যেমন, প্রফেসর জিজ্ঞেস করছিলেন:

'ইশকুলে তোকে মারে না তো রে খোকা?'

'রাতে অনিদ্রায় ভুগিস?'
'সকালে মাথা ধরে না?'
'কিংবা সন্ধ্যায়?'
'রাতে দুঃস্বপ্ন দেখিস না তো?'
'মূর্ছা গেছিস কখনো?'
এবং এ সমস্ত প্রশ্নেই বাবা জবাব দিলে:
'না।'
তখন প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন:
'ইশকুলটা তোর পছন্দ হয়ত?'
'ইশকুলের দিদিমণিটি কেমন, ভালো তো?'
'ইশকুলে তোর বন্ধু আছে তো?'
'ছেলে বন্ধু?'
'মেয়ে বন্ধু?'
এবং এই সব প্রশ্নেই ছোট্ট বাবা জবাব দিলে:
'হ্যাঁ।'
অবশেষে প্রফেসর বললেন:
'আচ্ছা বলত, সব মেয়ের চেয়ে কোনো একটা মেয়েকে তোর বেশি ভালো লাগে কিনা?'
বাবা তখন চটে উঠে বললে:
'এ সবে আপনার কী দরকার ডাক্তার? ইশকুলে যাই না পিঙ-পঙ খেলার জন্যে। খামোকা ও সব জিজ্ঞেস করছেন।'
'তা বেশ,' বললেন প্রফেসর, 'কিন্তু এখন তুই করবি-টা কী?'
'পিঙ-পঙ খেলব,' জবাব দিতে একটুও দেরি হল না বাবার।
'কিন্তু তার পরিণাম কী হতে পারে ভেবে দেখেছিস?'
'ভেবে দেখেছি,' বললে বাবা, 'পরিণামে মস্কো কিশোর গ্রুপের সব্বাইকে হারিয়ে দিতে পারি।'
'ফাজলামি করবি না, বলছি!' চ্যাঁচালেন প্রফেসর।
'সত্যি কথাই বলছি,' বললে বাবা।
তখন প্রফেসর হতাশে হাত নেড়ে ছোট্ট কাচের গ্লাসে খানিকটা ওষুধ ঢাললেন। বললেন:
'খেয়ে নে।'
বাবা বললে:

'বারে, ওষুধ খাব কেন, আমার তো অসুস্থ বোধ হচ্ছে না।'

'কিন্তু আমার হচ্ছে,' ব'লে নিজেই ওষুধটা খেয়ে নিলেন প্রফেসর। তারপর শান্ত গলায় বললেন:

'ধর তোর মা-বাপে যদি বলে এখন যত খুশি খেলতে পারিস, কিন্তু শরৎকালে ইশকুলে যেতে হবে, রাজী আছিস?'

'রাজী,' বললে বাবা।

প্রফেসর তখন ঠাকুর্দা ঠাকুমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন:

'না, ছেলেটির রোগ টোগ কিছু নেই। এখন খেলতে চায় খেলুক। এ বছর তো এমনিতেই গেছে।' ব'লে ফের আরেকটু ওষুধ খেলেন।

ছোট্ট বাবাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হল।

ছোট্ট বাবার টিম কিন্তু প্রথম হতে পারে নি, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু বছরটা যে বৃথা গেছে সে কথা বাবা আজো ভাবে না। তবে এটা বাবা ভালোই টের পেয়েছিল যে শুধু পিঙ-পঙ নিয়ে দিন কাটানো যায় না। বলতে কি নিজের ইশকুলের জন্যে মন-কেমনই করত তার। তারপর শরতে ইশকুলের নতুন বছর শুরু হতে আনন্দেই ক্লাসে গেল বাবা। ইশকুল শেষ হল। বহু বছর কেটে গেছে তারপর। আলমারিতে এখনো তার সেই পুরনো পিঙ-পঙ ব্যাটটি আছে। ঠাকুর্দা ঠাকুমার চোখে সেটা পড়লে তাঁরা এখনো মুখ ব্যাজার করেন। বাবা কিন্তু খুশি হয়েই তাকায় সেটার দিকে। অবিশ্যি পিঙ-পঙের জন্যে ইশকুল ছেড়ে দেওয়াটা খুবই বোকামি হয়েছিল। সে গল্প শুনে আজো পর্যন্ত বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি করে সবাই। বাবার নিজের কাছেও সেটা এখন পাগলামি মনে হয়। তাহলেও পিঙ-পঙ খেলাটা খাসা। তা নিয়ে আলাদা ক'রে পরে কিছু একটা লিখব। নিশ্চয় লিখব।

তারপর একদিন ছোট্ট বাবার মেয়েটিও যখন পিঙ-পঙ খেলা ধরলে, তখন ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছিল বাবা। তবে ভারি খুশি হয়েছিল এই দেখে যে পিঙ-পঙের জন্যে মেয়েটি ইশকুল যাওয়া বন্ধ করছে না। অথচ খারাপ খেলত না মেয়েটি, ইশকুলের চ্যাম্পিয়ন।

তখন ঠাকুর্দা ঠাকুমার দুশ্চিন্তাটা খানিক আঁচ করতে পারলে বাবা। আলমারিতে নিজের পুরনো ব্যাটটি সরিয়ে ফেললে।

তবে এখনো মাঝে মাঝে সেটি বার করে দেখে আর মনে পড়ে যায় পুরনো এই কাহিনীটা।

বাবা যখন ছোটো, ইশকুলে পড়ছে, তখন নিজেই একবার একটা টুল বানায় বাবা। সারা জীবন সে টুলটার কথা বাবার মনে আছে। আশ্চর্য সে টুল, দুনিয়ায় তেমন আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া ভার। অন্তত তাই ভাবতেন হাতের কাজের মাস্টার জাখার পেত্রভিচ।

বাবাদের ইশকুলে ছিল একটা ছুতোর কারখানা। সেখানে জাখার পেত্রভিচ কাঠের কাজ শেখাতেন ছাত্রদের। কাঠ চেরা, ফোঁড়া, চাঁছা, জোড়া ও ভেঙে ফেলে ফের নতুন ক'রে সব শুরু করতে শেখাতেন তিনি। যতক্ষণ না জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে। লোকটি বিশেষ লম্বা নন, বুড়ো, চোখে লোহার ফ্রেমের চশমা। প্রায়ই বলতেন, 'কাজ আঁতকায় ওস্তাদকে দেখে', মাঝে মাঝে যোগ করতেন, 'আর আলসে আঁতকায় কাজ দেখে'।

প্রথম পাঠ তাঁর শুরু হয়েছিল এইভাবে:

'এটা কী জিনিস?'

'হাতুড়ি!' চ্যাঁচাল সবাই।

'ঠিক কথা। আর এটা?'

'পেরেক!'

'ঠিক! আর এটাকে কী বলে?'

'তক্তা!'

'ভালো কথা। এবার এই হাতুড়ি দিয়ে পেরেকটিকে এই তক্তায় এক ঘায়ে বসাতে হবে। পারবে?'

'পারব! পারব!'

অনেকেই এক পায়ে খাড়া। কিন্তু যে সব ছেলেদের গায়ে বেশ জোর আছে তারাও পারলে না। জাখার পেত্রভিচ তখন পেরেকটি নিয়ে তক্তার ওপর রেখে ঘা মারলেন। খুব একটা জোর বাড়ি নয়। কিন্তু সবাই হাঁ হয়ে গেল: তক্তার মধ্যে একেবারে মাথা পর্যন্ত গেঁথে গেছে পেরেকটা।

'আসল কথা হল চোখের আন্দাজ আর নিখুঁত ঘা,' বললেন জাখার পেত্রভিচ, 'বুঝেছ?'

ছোট্ট বাবা বললে, 'বুঝেছি', আর হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারলে নিজের আঙুলেই।

বেশ লেগেছিল। কিন্তু হেসে উঠল সবাই।

জাখার পেত্রভিচ বললেন:

'হাসির কিছু নেই হে। কী ভেবেছ, বরাবরই কি আর আমি ঠিক পেরেকের মাথাতেই মেরেছি? একেবারে না। হাতুড়ির বাড়ি পড়ত আঙুলে, তার ওপর কর্তার চাঁটি পড়ত মাথায়। বলে অমন ভুল হয় কেন... এই ক'রেই আমরা শিখেছি।'

ছোটোবেলার জাখার পেত্রভিচের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল সবারই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উনি হেসে উঠলেন। বললেন:

'ভয় নেই, আমি কাউকে মারব না। এখানে তোমরা নিজেরাই হলে কর্তা। এ সবই তোমাদের। শুরুতে টুল বানানো শেখা যাক।'

টুল! মনে হবে সে তো ভারি সোজা জিনিস। নিজে একবার বানিয়ে দ্যাখো। তাও আবার কাঁটায় কাঁটায় মাপ মতো! ওহ, কত যে করাত চালাতে, চাঁছতে, জোড় দিতে, খুলতে এবং ফের গোড়া থেকে সব শুরু করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই! তার জন্যে কত না মেহনত দরকার, কত ঝঞ্ঝাট, কত মাথা-খেলানো আর কতই না ধৈর্য...

প্রথম টুলটা বানালে মিশা গবর্নভ।

'বসে দেখুন!' সগর্বে ঘোষণা করলে সে।

'তুই নিজেই বস্!' বললেন জাখার পেত্রভিচ।

মিশা গর্বুনভ খুব ভারিক্কি মুখ ক'রে সন্তর্পণে বসতে গেল তার টুলের ওপর। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল টুলটা। দেখা গেল মেঝের ওপর বসে আছে মিশা, সবাই হাসছে।

'তড়িঘড়ি কাজ বটে, সড়গড় নয়!' বললেন জাখার পেত্রভিচ, 'ফের গোড়া থেকে শুরু কর। ছটফট করবি না, নয়ত ফের লোক হাসাবি।'

কেউই এক বারেই বানাতে পারলে না, সকলকেই কেঁচে গণ্ডুষ করতে হল।

'ভাবনা নেই হে,' সান্ত্বনা দিলেন জাখার পেত্রভিচ, 'একদিনেই তো আর মস্কো গড়ে ওঠে নি। কী ভেবেছিলি তোরা। করাত চালানো, র‍্যাঁদা ঘসা — সেটা সবাই পারে? পারে তা ঠিক। তবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে প্রথমে...'

প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল ছেলেরা। ঠিক ক্লাসের মতোই তো ব্যাপার: যেন কে আগে কষবে অঙ্কটা। মজাও আছে বেশ। অঙ্কের ওপর তো আর কেউ বসে না। কষল, বাস ফুরিয়ে গেল। কিন্তু এখানে সবাই নিজের টুলটির ওপর বসতেও পারবে। বসার জন্যে নেমন্তন্নও করতে পারবে সবাইকে।

সত্যিকারের টুল প্রথম বানালে ভারিয়া গ্লাজুনভা। মেয়ে! তবে ওর বাবা তো কাঠের কাজের ওস্তাদ। করাত র‍্যাঁদার শিক্ষা ও বাপের কাছেই পেয়েছে। জাখার পেত্রভিচ খুবই তারিফ করলেন ভারিয়ার।

'পাকা কাজ! ছেলেগুলোর মুখ চুন ক'রে দিলে!'

ছেলেদের অপমান লাগল। ভারিয়াকে খেপাতে শুরু করলে তারা। বললে, 'ভারিয়া-মণি ছুতোরাণী!'

ভারিয়া কিন্তু চটলে না। শুধু জিজ্ঞেস করলে:

'কিন্তু তোদের টুলটি কোথায়, দ্যাখা একবার।'

এর আর কী জবাব দেবে ছেলেরা।

দ্বিতীয় টুলটা কিন্তু করলে মিশা গর্বুনভ। ফলে ছেলেরা খানিকটা শান্ত হল। তারপর কেমন যেন হঠাৎ সবাই একসঙ্গে তাদের টুল জমা দিতে লাগল। জাখার পেত্রভিচ বললেন:

'তা ভলোদিয়ার টুলটা খানিকটা টুলের মতো দেখাচ্ছে।'

শেষ পর্যন্ত ছোট্ট বাবাও তার টুল বানালে। ততদিনে হাত পা তার এখানে কাটা ওখানে ছেঁড়া, নাকে গালে ছুতোর মিস্ত্রির আটা। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বাবার। তার জীবনের প্রথম টুলটি যে তৈরি! সে টুলের জন্মদিনে তার যত আনন্দ হয়েছিল সেটা যে তার নিজের জন্মদিনেও হয় নি। নিশ্চয় সেটা ভালোই টের পেয়েছিলেন জাখার পেত্রভিচ।

দৈব বাণী দিলেন:

'নে, ব'স।'

অতি সন্তর্পণে ছোট্ট বাবা বসল তার টুলের ওপর। এতটুকু ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ পর্যন্ত হল না। কিন্তু জাখার পেত্রভিচ ভুরু কোঁচকালেন। আস্তে ক'রে বললেন:

'পা গুণে দ্যাখ।'

ছোট্ট বাবার ভারি অবাক লাগল। নিজের পায়ের দিকে তাকাল বাবা। আগের মতোই তো সেই দুটি পা। হঠাৎ যত ছেলেমেয়ে সবাই হাসতে শুরু করে দিলে এই সময়। কেউ কেউ আবার হেসে গড়াতে লাগল মেঝের ওপর। জাখার পেত্রভিচও হেসে ফেললেন।

আজো পর্যন্ত বাবা ভেবে পায় না পাঁচ পায়ার টুল বানাবার বুদ্ধি তার কেমন ক'রে খেলেছিল। কিন্তু কোনো ভুল নেই। পাঁচ পায়েই দাঁড়িয়ে আছে টুলটা। আজো পর্যন্ত পাঁচ পায়েই তা বাবার চোখে ভাসে। চার পা নয়, পাঁচ পা! আজো পর্যন্ত জাখার পেত্রভিচের কথাটা কানে বাজে বাবার, 'তিন পেয়েও নয়, পাঁচ পেয়েও নয়! ফের শুরু কর!' যে কোনো কাজেই এ কথাটা মনে রাখা দরকার সেটা বাবা এখন বোঝে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union